গ্রাভিটন

অক্টোবর ২০২৪

ফ তে Physics প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ই-ম্যাগাজিন

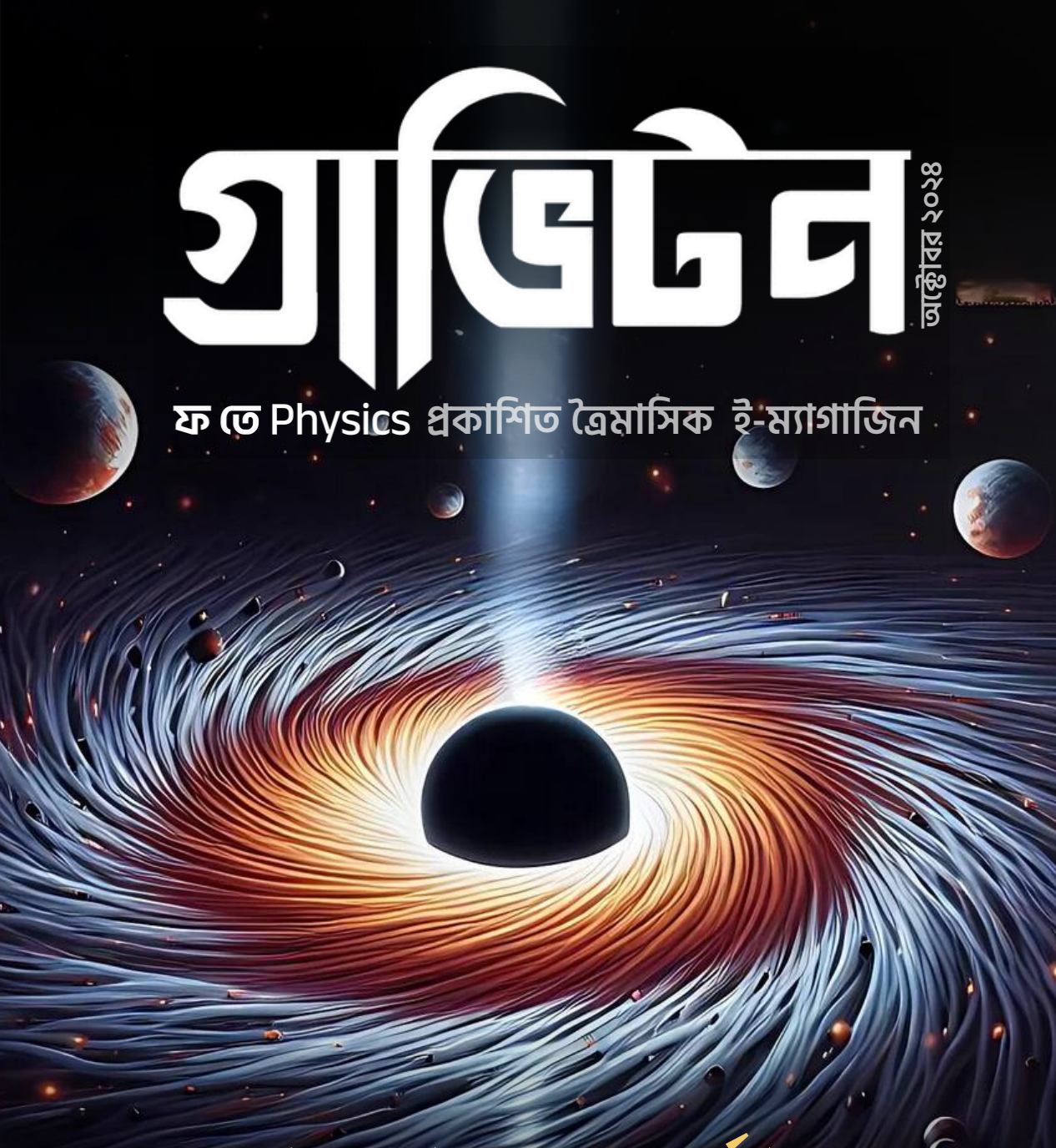

স্থান-কালের অন্তর্জাল

ফিচার ০৫ টি

সায়েন্স ফিকশন ০২ টি

ফিজিক্স প্রশ্নোত্তর

আরও অনেক কিছু

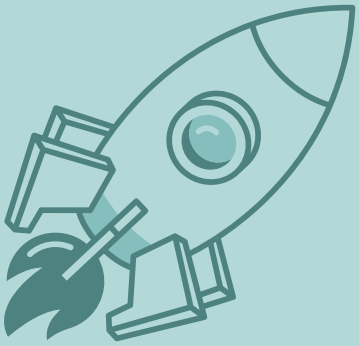

কোন সমস্যা সমাধান করার সময়টাতে দুশ্চিন্তা করো না। যখন সমাধান করা শেষ হলো তখনই আসলে দুশ্চিন্তা করার উপযুক্ত সময়।

রিচার্ড ফাইনম্যান

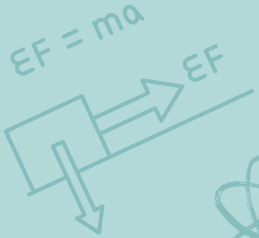

গ্রাভিটন

ফ তে Physics প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ই-ম্যাগাজিন

অক্টোবর ২০২৪ | বর্ষ : ১ | সংখ্যা: ১

সম্পাদক

মো: মখদুম আমিন ফাহিম

নির্বাহী সম্পাদক

মুবতাসিম মুনিম

সহ সম্পাদক

আইনুল হক ইউসুফ

ডিজাইন

মুবতাসিম মুনিম

আইনুল হক ইউসুফ

ব্যাবস্থাপক

তানভির মাহতাব রাফি

তীর্থ প্রতীম মন্ডল

Facebook Page: Tap Here

Mail: editor01.graviton@gmail.com

Bkash no: 01924313102

OFFICIAL PAGE

CLICK HERE

ফ তে Physics কী?

ফ তে Physics হলো একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশে পদার্থবিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে এবং মানুষকে পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী করতে কাজ করে। ২০২২ সালের ১৩ই অক্টোবর মখদুম আমিন ফাহিম পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোরের একদল পদার্থবিজ্ঞানপ্রেমী উদ্দীপ্ত কিশোরদের নিয়ে ফ তে Physics এর যাত্রা শুরু করে। ফ তে Physics আস্তে আস্তে বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফ তে Physics সময়ের সাথে পদার্থবিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। ফ তে Physics এবছর একটি লেখালেখির প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ফ তে Physics একটি বুকশপ ও প্রকাশনা চালু করার কাজ করছে, যার নাম Cosmic Publication and Book Shop। সাথে বাংলাদেশের প্রথম পদার্থবিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশ করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যার নাম গ্রাভিটন। ভবিষ্যতে ফ তে Physics আরও অনেক উদ্যোগ নিয়ে আসবে। আশাকরি, সবাই ফ তে Physics এর পাশে থাকবে এবং বাংলাদেশে পদার্থবিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে একসাথে কাজ করবে।

আজই জয়েন করুন ফ তে Physics এর ফেসবুক গ্রুপে

JOIN NOW

ফ তে Physics

Director Board

1. President
MD. Mokhdum Amin Fahim
2. General Secretary
Inul Haque Yusuf
3. IT Secretary
Mubtasim Munim
4. Treasurer
Sriyan Adhikary
5. Secretary of Mathematics
Farhan Sadik
6. Secretary of Astronomy
Mondira Biswas Athoi
7. Promotional Secretary
Tirtha Protim Mondal
8. Secretary of Women
Suraiya Ratry Orni
9. Publication Secretary
Tanvir Mahtab Rafi

সম্পাদকীয়

একটি নতুন পথচলা...

২০২২ সালের ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশে পদার্থবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু করেছিল “ফ তে Physics”। এখন তার ২ বছর পেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশের কিশোর-তরুণ সমাজের কাছে পদার্থবিজ্ঞানকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য। বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম বিজ্ঞান পত্রিকা ও সাময়িকী আছে। বিখ্যাত বিখ্যাত অনেক ম্যাগাজিন আছে। বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশনের একটি ম্যাগাজিন আছে, যার নাম মহাকাশবার্তা। মহাকাশবার্তা মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন। কিন্তু, বাংলাদেশে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো ম্যাগাজিন নেই। সাধারণ মানুষকে পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য একটি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন থাকা দরকার। সেই জন্য ফ তে Physics সিদ্ধান্ত নিল একটি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে হবে। ম্যাগাজিনটির নাম ঠিক করা হলো “গ্রাভিটন”, সেই তাত্ত্বিক কণার নামে যাকে মহাকর্ষের জন্য দায়ী মনে হয়। প্রথম সংখ্যা মূল সংখ্যার প্রতিপাদ্যও তাই ঠিক করা হলো মহাকর্ষকে।

নতুন উদ্যোগ, নতুন পথচলা। আশা করছি বাংলাদেশের পদার্থবিজ্ঞানপ্রেমী ভাই ও বোনেরা পাশে থাকবেন। “গ্রাভিটন” ম্যাগাজিন সফল হোক। সবার জন্য শুভেচ্ছা রইল।

মো: মখদুম আমিন ফাহিম

সূচিপত্র

ফিচার

ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি	০৬
মহাকাশের কালো হৃদয়	০৮
পারমাণবিক ঘড়ি	১৭
ভেরা রুবিন	২১
কোয়ান্টাম মহাকর্ষের সন্ধানে	২৩

সায়েন্স ফিকশন

আগামীর প্রতিধ্বনি	২৯
অস্তিত্বের আলো	৩২

মিচিও কাকুর সাক্ষাৎকার ১৪

বই রিভিউ: সিক্স ইজি পিসেস ১৯

মুভিতে ফিজিক্স: Loki 2 ২৬

নিয়মিত বিভাগ

- ধাঁধা ৩৩
- ফিজিক্স: প্রশ্নোত্তর ৩৪
- প্রব্লেম সলভিং ৩৭
- ফিজিক্স: কুইজ ৩৯

ফিচার ১

ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি

মন্দিরা বিশ্বাস অথৈ

পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল বিজয়ী আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত একটি উক্তি,"Nature conceals her mystery by her essential grandeur." অর্থাৎ প্রকৃতি তার অপরিহার্য মহিমা দ্বারা তার রহস্য গোপন করে। আমাদের জানা অজানার মধ্যে থাকা মহাবিশ্বের যত ধরনের পদার্থ ও শক্তি আছে তাদের বাইরেও অনাবিষ্কৃত আরও এক ধরনের পদার্থ ও শক্তি আছে। মহাবিশ্বের গঠনের মাত্র ৫% আমাদের পরিচিত ইলেক্ট্রন,প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি যা ব্যারিওনিক পদার্থ নামে পরিচিত। আর বাকি ৯৫% সেই অনাবিষ্কৃত ও আজানা পদার্থ ও শক্তি দিয়ে তৈরি। জ্যোতিঃবিজ্ঞানীরা এই অনাবিষ্কৃত পদার্থকে ডার্ক ম্যাটার এবং শক্তিকে ডার্ক এনার্জি নামে আখ্যায়িত করেছেন।
জ্যোতিঃবিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক অনুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন মহাবিশ্বের সেই অজানা ৯৫% এর ৬৮% গঠিত হয় ডার্ক এনার্জি দ্বারা এবং বাকি ২৭% গঠিত হয় ডার্ক ম্যাটার দ্বারা।

১৯৩৭ সালে প্রথমবারের মতো সুইস-মার্কিন জ্যোতিঃপদার্থবিদ ফ্রিৎজ জুইকি কোমা ক্লাস্টার থেকে আগত দৃশ্যমান আলোর অনুপাতে ভর নির্নয় করেন। এরপর ক্লাস্তারের মহাকর্ষ বল থেকে আবার ভর বের করলেন। পরীক্ষণের ফলাফল থেকে দেখা গেল আগের থেকে ভর বেশি আসছে। এই বাড়তি ভর কোথা থেকে আসল তার হিসাব না পাওয়ায় এর নাম রাখেন ডার্ক ম্যাটার।

এর অনেক বছর পর ১৯৭৬ সালে ভেরা রুবিন আবিষ্কার করেন,দূরের নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষের কারণে ছায়াপথে আটকে আছে। আবার নক্ষত্রগুলো ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে যত দূরে,সেগুলো কেন্দ্রের কাছের নক্ষত্রগুলোর চেয়ে তত বেশি দ্রুত ছুটছে। তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে এসব দূরের নক্ষত্রগুলো ডার্ক ম্যাটার বা অদৃশ্য কোনো বস্তুর জন্য ছায়াপথগুলোর সাথে আটকে আছে।

Fritz Zwicky (1898-1974)

আইনস্টাইন মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে কাজ করছিলেন। যার ফলস্বরুপ তিনি আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি মনে করতেন মহাবিশ্ব স্থির,শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। এই ধারণার প্রেক্ষিতে তিনি একটি কাঠামো প্রদান করেন- কিন্তু একটা সমস্যা থেকেই যায়! এই কাঠামোতে মহাকর্ষ বল সবসময় আকর্ষণধর্মী । কিন্তু যদি শুধু আকর্ষণমূলক মহাকর্ষ বলই থাকে,তবে সকল মহাজাগতিক বস্তু ধসে পড়ার কথা । এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিকর্ষণমূলক বলের প্রস্তাব দেন এবং তার সমীকরণে কসমোলজিক্যাল ধ্রুবক যোগ করেন । এই মডেলে কসমোলজিক্যাল ধ্রুবকের কাজ ছিল মহাকর্ষের বিরুদ্ধে কাজ করা ।

আইনস্টাইন এই তত্ত্ব প্রণয়নের প্রায় ১৩ বছর পর এডুইন পি হাবল আবিষ্কার করেন , মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয় ও ছায়াপথগুলো ক্রমশই আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে । তারমানে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। হাবলের এই আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে আইনস্টাইন তার সমীকরণ থেকে কসমোলজিক্যাল ধ্রুবটা বাদ দিয়ে দেন এবং এটাকে তার জীবনের সবথেকে বড় ভুল মনে করেন। আইনস্টাইনের সেই বড় ভুলকে ১৯৯৮ সালে জ্যোতিঃবিজ্ঞানীরা আবার সামনে আনল । তারা সুপারনোভা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন । তারা দেখেন ,এই সুপারনোভাগুলো প্রত্যাশার চেয়েও অনেক অনুজ্জ্বল ছিল । এর দুইটা কারণ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন । হয় এরা সাধারণ সুপারনোভার থেকে আলাদা ; না হয় তাদের দূরত্ব অনুমানের থেকেও অনেক বেশি । আর যদি এদের দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে থাকে তবে আমাদের মহাবিশ্ব প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত বেগে প্রসারিত হচ্ছে । আর এই অধিক প্রসারণ কসমোলজিক্যাল ধ্রুবক ছাড়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় । তাই ধ্রুবকটাকে আবার তার সমীকরণে ফিরিয়ে আনা হলো । এই দ্রুতগামী সুপারনোভা আবিষ্কার ছিল মহাবিশ্বের মহাকর্ষের বিরুদ্ধে কার্যরত বিশেষ এক বল। আর এই বলকে তখন ডার্ক এনার্জি নাম দেওয়া হয় । ডার্ক এনার্জি মূলত স্থানের আপেক্ষিকতা দিয়ে তৈরি ।

আপাতত ডার্ক ম্যাটার আর ডার্ক এনার্জি আমাদের কাছে এখনোই অন্ধকারই আছে। তবে ভবিষ্যতে আজকের প্রজন্মের বিজ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তিরা অবশ্যই এই অন্ধকার দূর করতে পারবে।

লেখক :
শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর;
Secretary of Astronomy, ফ তে Physics

ফিচার ২

ব্ল্যাকহোল

মহাকাশের কালো হৃদয়

তীর্থ প্রতিম মণ্ডল

একটু কল্পনা করার চেষ্টা করুন তো, আমাদের এই বিশাল মহাবিশ্বের এমন একটি জায়গার, যে জায়গাটি একই সাথে এত অন্ধকার, এত বিশালাকার এবং এতই রহস্যময় যে, এটি আমাদের প্রকৃতির সকল নিয়মকেই অগ্রাহ্য করে। এমন একটি জায়গা যেখানে সময়ই যেন স্থির হয়ে যায়, যেখান থেকে আলো, মহাজাগতিক গতি সীমায় চলেও বেরিয়ে আসতে পারে না, যেখানে মহাকর্ষ শক্তিই সর্বোচ্চ শাসক। এটিই হলো ব্ল্যাকহোল, মহাবিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় এবং ভয়ঙ্কর একটি সত্তা| বিশাল মহাজাগতিক মহাসাগরে এগুলো হলো ধ্বংসের ঘূর্ণি, যেখানে আমাদের চেনা পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো অকেজো হয়ে যায় এবং আমাদের চেনা জানা মহাবিশ্ব অজানার পথ দেখায়।

কিন্তু কি আসলে এই ব্ল্যাকহোল? এটি কি কেবলই একটি শূন্যতা, আমাদের মহাজগতের একটি ডাস্টবিন মাত্র? নাকি এটি আরো বেশি কিছু? হয়তোবা এটিই সময়ের শুরু কিংবা সময়ের শেষ! হয়তোবা এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত! ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য আমাদের প্রথমেই সাক্ষী হতে হবে একটি নক্ষত্রের জীবনের শেষ পর্যায়ের।

একটি নক্ষত্রের শেষ নিঃশ্বাস

আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করতে চলেছি একটি বিশাল নক্ষত্রের ভেতর থেকে। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে কোনো একটি বিশালাকার নক্ষত্র ক্রমাগত হাইড্রোজেন পরমাণুকে ফিউসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত করে এসেছে,

এবং আমাদের রাতের আকাশে একই সাথে উজ্জ্বল আবার ক্ষীণ ভাবে জ্বলে এসেছে। কিন্তু যে যত বড়ই হোক না কেনো, সকল কিছুরই অন্তিম কাল রয়েছে। অবশেষে, নক্ষত্রটি তার সকল জ্বালানি নিঃশেষ করে ফেলে। এবং নক্ষত্রটির অভ্যন্তরীণ নিউক্লিয়ার ফিউশন (nuclear fusion) এর বাহ্যিক চাপ, এবং নক্ষত্রটির মাধ্যাকর্ষণ বলের অভ্যন্তরীণ টানের সূক্ষ্ম ভারসাম্যটি হারিয়ে যায়। নক্ষত্রটি তার নিজের ওজনেই ভেঙে পড়ে, এবং প্রদর্শন ঘটায় একটি মহাজাগতিক আতশবাজির খেলার- সুপারনোভা (supernova)| এই বিস্ফোরণের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা হলো একটি কেন্দ্র বিন্দু, যার ঘনত্ব এতটাই বেশি যে, এটি পরিণত হয় একটি ব্ল্যাকহোলে।

একটি ব্ল্যাকহোল কে আরো ভালো ভাবে বোঝার জন্য আমাদের বুঝতে হবে এর ইভেন্ট হরাইজন (event horizon) কে, যেই সীমানা একবার অতিক্রম করলে কোনো কিছু, এমনকি আলোও ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষ বলকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে আসতে পারে না। তবুও এটিই কিন্তু একটি ব্ল্যাকহোলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অংশ নয়। ব্ল্যাকহোলের আরো গভীরে আছে সিঙ্গুলারিটি (singularity), একটি বিন্দু যেখানে স্পেস-টাইম এর বক্রতা হয়ে যায় অসীম, এবং যেখানে আমাদের জানা ফিজিক্স এর সকল তত্ত্বই অকার্যকর হয়ে পড়ে। এটিই হলো আমাদের চেনা-জানা মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত, যেখান থেকে আরম্ভ হয় অজানার |

ব্ল্যাকহোলের ইতিহাস

ব্ল্যাকহোলের ধারণাটি গত কয়েক শতাব্দী ধরে বেশ বিকশিত হয়েছে। তবে এর সূচনা হয়েছিল, জন মিশেল (John Michell) এর 1783 সালে লেখা একটি চিঠিতে, যেখানে তিনি সর্বপ্রথম "ডার্ক স্টার" (dark star) এর ধারণার প্রস্তাব দেন- নক্ষত্র এতো বিশাল, যে আলোও তাদের কবল থেকে বের হতে পারে না। মিশেল এর হিসাব অনুযায়ী, কোনো নক্ষত্রের ব্যাস যদি আমাদের বহুল পরিচিত সূর্য থেকে 500 গুণ বেশি হয়, তাহলে সেই নক্ষত্র এই "ডার্ক স্টার" এ পরিণত হতে পারে। কিন্তু এই ধারণাটি আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব(wave theory of light) এর আবির্ভাবের পরেই তার যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলে। যদিও, এটি ছিল 1915 সাল, যখন আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein) তার বিশ্ববিখ্যাত জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভির (General theory of relativity) এর প্রকাশ করেন, এবং 'ডার্ক স্টার' এর ধারণাটি আবার শক্তিশালী ভিত্তি লাভ করে।

যদিও আইনস্টাইন এর সমীকরণ গুলোই ব্ল্যাকহোলের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, 1916 সালে কার্ল শোয়ার্জশিল্ডই (Karl Schwarzschild) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি আইনস্টাইন এর সমীকরণ গুলোর সঠিক সমাধান খুঁজে বের করেন। তার সমাধান একটি গোলক ভরের চারিদিকের স্পেস-টাইম (space-time) এর বক্রতাকে ব্যাখা করে এবং আরো একটি ধারণার প্রস্তাব দেয়, "শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ" (Schwarzschild radius), একটি সীমানা যেখানে স্পেস-টাইম এর বক্রতা হয়ে যায় অসীম, এবং যার ভেতর থেকে কোনো কিছুই বের হয়ে আসতে পারে না। কথা গুলো পরিচিত মনে হয়, না?

1931 সালে, ভারতীয় উপমহাদেশের সুব্রামানিয়ান চন্দ্রশেখর (Subrahmanyan Chandrasekhar) "চন্দ্রশেখর লিমিট' (Chandrasekhar limit) আবিষ্কারের মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলের ধারণাটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি এ বিষয়ে বলেন, একটি নির্দিষ্ট ভরের চেয়ে বেশি ভরবিশিষ্ট সকল নক্ষত্রই অনিবার্যভাবে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হবে। এই ধারণাটি আরো সমর্থন লাভ করে 1939 সালে, যখন জে. রবার্ট ওপেনহেইমার (J. Robert Oppenheimer) এবং হার্টল্যান্ড স্নাইডার (Hartland Snyder) তাদের গবেষণায় দেখান

যে, নক্ষত্র সমূহের পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে তাদের অমন বিস্ফোরণ এবং পরবর্তীতে ব্ল্যাকহোলে পরিণত হওয়াটা বাস্তবেই সম্ভব। এটিই পরবর্তীতে ব্ল্যাকহোল এর তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যদিও 'ব্ল্যাকহোল' নামটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন জন হুইলার (John Wheeler) এসবের অনেক পরে, 1967 সালে। কিন্তু ব্ল্যাকহোল কেবলমাত্র তাত্ত্বিক কৌতূহল থেকে বাস্তব জগতের পর্যবেক্ষিত ঘটনাতে পরিণত হয় 1964 সালে, সিগনাস এক্স-1 (Cygnus X-1) নামক ব্ল্যাকহোলের আবিষ্কারের পরে। সাইগনাস এক্স-1 থেকে নির্গত উচ্চ মাত্রার এক্স-রে (x-ray) থেকে এটিকে চিহ্নিত করা হয়, যেটিকে ব্ল্যাকহোল এর পরিচয় দেওয়া হয় 1971 সালে। তবে ব্ল্যাকহোল নামক মহাজাগতিক বস্তুর অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় 2015 সালে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (gravitational wave) শনাক্তকরণের মাধ্যমে। এবং অবশেষে ব্ল্যাকহোলের প্রথম চিত্র ধরা পরে 2019 সালে ইভেন্ট হোরাইজন টেলিস্কোপ (Event Horizon Telescope) এর মাধ্যমে, যেটি ছিল মেসিয়ার 87 (Messier 87) গ্যালাক্সি এর কেন্দ্রে অবস্থিত ব্ল্যাকহোল। এই আবিষ্কার ব্ল্যাকহোলের গবেষণায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে, এবং একই সাথে ব্ল্যাকহোল কে পরিচিতি দেয় আমাদের মহাবিশ্বের একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে।

Supermassive Black hole

Steller Black hole

Miniature Black hole

ব্ল্যাকহোলের রকমফের

স্বাভাবিকভাবেই মহাবিশ্বের সকল ব্ল্যাকহোল সমান ভাবে তৈরি হয় না, এদের আকার-আকৃতি ও ধরনে থাকে বিভিন্নতার ছোঁয়া। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ও সর্বাধিক সংখ্যায় রয়েছে "স্টেলার ব্ল্যাকহোল"(Steller Blackhole)। এগুলো তৈরি হয়ে থাকে বিশাল নক্ষত্রের মৃত্যুর পর তাদের অবশিষ্টাংশ থেকে, ঠিক যেমনটি আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। এগুলো যেন ব্ল্যাকহোল পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান, যেগুলোর ভর সাধারণত আমাদের সূর্যের ভরের কয়েক গুণ থেকে কয়েক দশ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Karl Schwarzschild
1873 - 1916

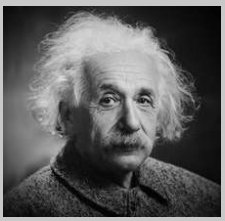
Albert Einstein
1879 - 1955

কিন্তু এছাড়াও মহাকাশে রয়েছে "সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল" (Supermassive Blackhole), মহাজাগতিক দৈত্য স্বরুপ, যেগুলো সাধারণত অধিকাংশ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থান করে। আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সি, মিল্কিওয়ে (Milky Way) এর কেন্দ্রও এমনি একটি সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের ঠিকানা, যার নাম স্যাজিট্যারিয়াস এ* (Sagittarius A*)| এই বিশালাকার দানবদের ভর আমাদের সূর্যের চেয়ে মিলিয়ন এমনকি বিলিয়ন গুণ বেশিও হতে পারে। কিন্তু এগুলোর সৃষ্টি কীভাবে হয়, তা এখনো গভীর গবেষণা ও রহস্যের বিষয়। ধারণা করা হয় যে, ছোট ছোট একাধিক ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষ তথা তাদের সংমিশ্রণ থেকে, অথবা মহাকাশের বিশাল গ্যাসের মেঘ স্বরুপ তাদের নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে ভেঙে পড়লে এই ধরনের ব্ল্যাকহোলের জন্ম হতে পারে। এই সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলসমূহ একদিকে গ্যালাক্সিসমূহ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং অন্যদিকে একটি গ্যালাক্সির অভ্যন্তরীণ সকল কিছু একত্রে ধরে রাখার ক্ষেত্রেও মহাজাগতিক নোঙ্গর হিসেবে কাজ করে।তারপর আরো রয়েছে "প্রিমোর্ডিয়াল ব্ল্যাকহোল" (Primordial Blackhole), মহাবিশ্বের জন্মের সময়ে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোল। এবং রয়েছে "ইন্টারমিডিয়েট ব্ল্যাকহোল" (Intermediate Blackhole), ব্ল্যাকহোলের দুনিয়ার আরও একটি রহস্যে ঘেরা শ্রেণি, যেগুলো কিনা "'সুপার ম্যাসিভ" দৈত্যরা কীভাবে তৈরি হয় তার চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

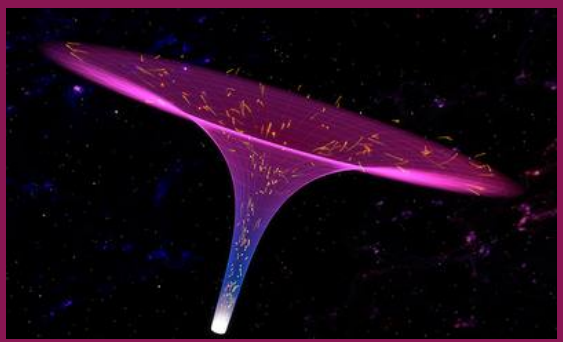

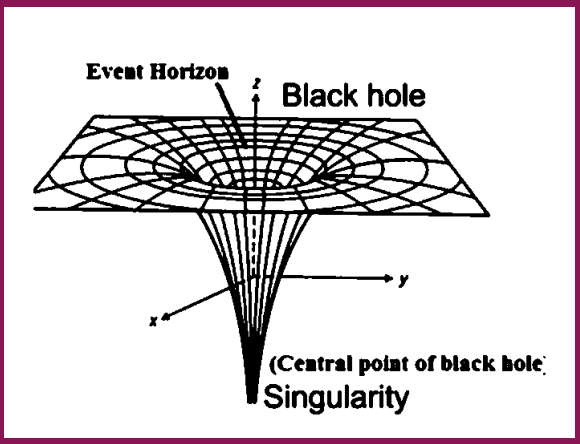

ইভেন্ট হোরাইজন এবং সিংগুলারিটি

এবার আসুন ব্ল্যাকহোলের ভয়ংকর শক্তির আরো গভীরে যেয়ে অনুসন্ধান করা যাক। ইভেন্ট হোরাইজন (Event Horizon) কিন্তু কেবলমাত্র একটি সীমানা না, এটি হলো মহাবিশ্বের চূড়ান্ত ওয়ান-ওয়ে স্ট্রিট। কোনো কিছু এটি একবার অতিক্রম করলে, তার আর ফিরে আসার আর কোনো সম্ভবনা থাকে না। কিন্তু কোনো বস্তু যদি একটি ব্ল্যাকহোলের এই ফিরে না আসার সীমানা অতিক্রম করেই ফেলে, তাহলে সেই বস্তুটির কি হবে? প্রশ্নটি যদি একটু অন্যভাবে করি, যদি আপনি নিজে কোনো ব্ল্যাকহোলের ভেতরে পড়ে যান, তাহলে আপনার কি হবে? আপনি কি মারা যাবেন? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। কিন্তু কীভাবে? আপনার দেহটিরই বা কি হবে? এর উত্তর হলো স্প্যাগেটিফিকেশন (Spaghettification), যে প্রক্রিয়ায় আপনার দেহ প্রথমে প্রসারিত হতে থাকবে, এবং প্রসারিত হতে হতে ক্রমে তা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, এবং অবশেষে তার প্রত্যেকটি পরমাণু এক অপর থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়বে। এটি একটি ভয়াবহ পরিণতি অবশ্যই, কিন্তু ফিজিক্স এর দৃষ্টিকোণ থেকে আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাপূর্ণও বটে।

এরপর রয়েছে সিংগুলারিটি (Singularity), ব্ল্যাকহোলের হৃদয়, যেখানে সেই ব্ল্যাকহোলের সমস্ত ভর একটি কেন্দ্রে ঘনীভূত থাকে। এখানে

ব্ল্যাকহোলটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রবল, যে এখানে স্পেস-টাইম এর বক্রতা অসীম মাত্রায় পৌঁছে যায়। একটি ব্ল্যাকহোলের সিংগুলারিটি হলো মহাবিশ্বের সেই স্থান, যেখানে এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের যত তত্ত্ব, যত ধারণা, বিশেষত আইনস্টাইন এর জেনারেল থিওরী অফ রিলেটিভিটি, সব আমাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখায়। এটি সম্পূর্ণই একটি রহস্য, যেখানে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান এর সকল তত্ত্বই তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

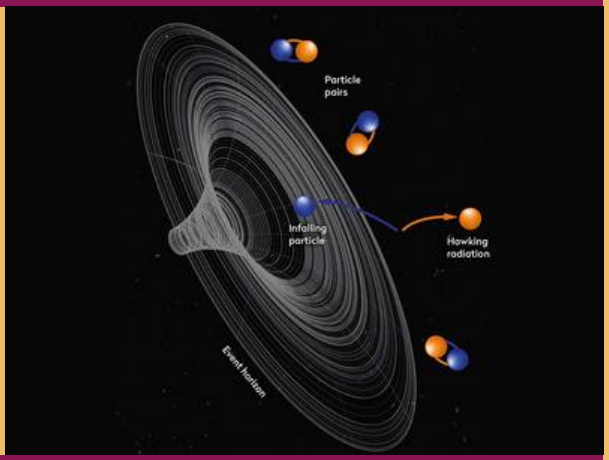

হকিং রেডিয়েশন

ব্ল্যাকহোল কিন্তু শুধুই অন্ধকার, সর্বগ্রাসী খাদক না। 1974 সালে, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (Stephen Hawking) এ বিষয়ে একটি মতবাদের প্রস্তাব দিয়েছেন। তার মতে, ব্ল্যাকহোল সমূহ তাদের ইভেন্ট হোরাইজনের নিকটে সংঘটিত বিভিন্ন কোয়ান্টাম ইফেক্টের কারণে বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ (Radiation) নির্গত করতে পারে। এই ধারণা, যা বর্তমানে "হকিং রেডিয়েশন" (Hawking Radiation) নামে পরিচিত, অনুযায়ী ব্ল্যাকহোল সমূহও ধীরে ধীরে তাদের ভর হারাতে থাকে, এবং এক পর্যায়ে তাদের সমস্ত ভরও হারিয়ে ফেলতে পারে। বলা বাহুল্য হকিং রেডিয়েশনের এই ধারণাটি চারিদিকে সারা ফেলে দিয়েছিল। এই তত্ত্ব আমাদের আরো বলে, ব্ল্যাকহোল কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ কালো নয়, তারাও খুব ক্ষীণ ভাবে হলেও আলো বিকিরণ করে। এই হকিং রেডিয়েশন এর তত্ত্বই আমাদের সর্বপ্রথম এই ধারণা দেয় যে, ব্ল্যাকহোল সমূহ চিরন্তন নয়। পর্যাপ্ত সময় পর, রেডিয়েশন ছাড়া আর কিছুই না রেখে, এরাও শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে।

ব্ল্যাকহোল এবং মহাবিশ্বের পরিণতি

ব্ল্যাকহোল কেবলমাত্র মহাজাগতিক মৃত্যুফাঁদ নয়, তারা সৃষ্টির চালনা শক্তিও। গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল গুলো নক্ষত্রের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে, সৌর জগতের নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথকে প্রভাবিত করে, এমনকি নতুন গ্যালাক্সির জন্মের ক্ষেত্রেও তারা প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে।

যখন একাধিক ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষ হয়, তখন তারা এক ধরনের তরঙ্গ ছড়াতে থাকে, যা গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ (Gravitational Wave) নামে পরিচিত। এই অদৃশ্য মহাজাগতিক তরঙ্গগুলো আমরা পৃথিবী থেকেই লাইগো (LIGO) এবং ভার্গো (VIRGO) এর মতো গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি (Gravitational Wave Observatory) এর সাহায্যে শনাক্ত করতে পারি। এই পর্যবেক্ষণগুলো যেন আমাদের মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ অজানা একটি দোয়াল উন্মোচন করে দিয়েছে। কিন্তু এসবের ভবিষ্যৎ কী? সময়ের ক্রমে মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে যখন সকল নক্ষত্র একে একে শেষ হয়ে যাবে, তখন হয়তোবা ব্ল্যাকহোলই আমাদের বর্তমান উজ্জ্বল-প্রাণবন্ত মহাজগতের শেষ অবশিষ্টাংশ হয়ে থাকবে।

টাইম ট্রাভেল এবং মাল্টিভার্স?

ব্ল্যাকহোল কী, এবিষয়ে আমরা কম-বেশি ধারণা অর্জন করতে পেরেছি। কিন্তু ব্ল্যাকহোল সমূহ কি এগুলোর বাইরেও আরো কিছু হতে পারে না? কে জানে, এগুলো হয়তো কোনো রহস্যময় মহাজাগতিক প্রবেশদ্বার। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, ব্ল্যাকহোলের নিকটে স্পেস-টাইমের তীব্র বক্রতা আমাদের মহাবিশ্বের সময়ের মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারে, অন্য ভাষায়, টাইম ট্রাভেল এর মতো সায়েন্স ফিকশনকেও বাস্তবে রূপদান করতে পারে। এবং একটি আরো উত্তেজনাপূর্ণ ও আরও আকর্ষণীয় ধারণা এই যে, ব্ল্যাকহোল সমূহ সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো মহাবিশ্বের প্রবেশদ্বারও হতে পারে। কোনো বস্তু যখন কোনো ব্ল্যাকহোলের সিংগুলারিটিতে প্রবেশ করে, এটা কি একেবারেই অসম্ভব, যে সেই বস্তুটি ভিন্ন কোনো মহাবিশ্বে পুনরায় আবির্ভূত হয়, হয়তোবা কোনো হোয়াইট হোলের মধ্য থেকে? এটি একটি চিত্তাকর্ষক ভাবনা, যা ব্ল্যাকহোলকে আমাদের জন্য হুমকি থেকে সময় এবং মাল্টিভার্স এর রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠিতে পরিণত করে। যদিও এসকল কিছুই এখনো কেবলমাত্র আমাদের ধারণা, এই ধারণা গুলোই আমাদের মতে এই মহাবিশ্বে কি কি সম্ভব, তার সীমানাকে বিস্তৃত করে।

ব্ল্যাকহোল শুধুই আমাদের মহাবিশ্বের একটি প্যারাডক্সই না, এগুলো আমাদের অসীম বিস্ময় এবং মুগ্ধতারও উৎস। ব্ল্যাকহোল সমূহ মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানায়, তাদের রহস্যকে উন্মোচন করতে যেন আমাদের আমন্ত্রন জানায়। এবং ভবিষ্যতে যখন আমরা আমাদের মহাজাগতিক অন্বেষণ চালিয়ে যাবো, ব্ল্যাকহোল গুলোই থাকবে আমাদের গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয়। এই ব্ল্যাকহোল সমূহই আমাদের মনে করিয়ে দেবে, এই মহাবিশ্ব আমাদের কল্পনার থেকেও অনেক বেশিই বিস্ময়কর, ভয়ংকর এবং রহস্যময়।

তথ্য সূত্র :
উইকিপিডিয়া, স্পেস ডট কম, নাসা, ব্রিটানিকা, ভেরিটেসিয়াম

লেখক :
শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর
Promotional Secretary, ফ তে Physics

সাক্ষাৎকার

মিচিও কাকুর সাক্ষাৎকার

অনুবাদ : মোঃ মখদুম আমিন ফাহিম

মিচিও কাকু বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদার্থবিদদের একজন। তিনি "স্ট্রিং থিওরি" ও "থিওরি অব এভরিথিং" নিয়ে কাজ করে। তিনি এক ফিউচারিস্টও। তিনি বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রেও অনেক ভূমিকা রাখেন। তিনি অনেকগুলো বেস্টসেলার বই লিখেছেন। তার বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে রয়েছে গড ইকুয়েশন, হাইপারস্পেস, প্যারালাল ইউনিভার্স ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বিভিন্ন টিভি সিরিজ ও ডকুমেন্টারিও করেন। ক্যালিফোর্নিয়া স্কুল নিউজ তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী হওয়ার এবং প্রযুক্তির ভবিষ্যতবাণী করার পিছনের কাহিনী সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে পারেন? আপনি কিভাবে এগুলোর প্রতি আগ্রহী হলেন? আপনার এই আগ্রহ কি ছোটবেলায় জন্মেছিল নাকি পরে বিকশিত হয়েছিল?

মিচিও কাকু : পদার্থবিদ্যার প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মেছিল যখন আমার বয়স ৪ বছর। সবাই তখন এক মহান বিজ্ঞানীর কথা বলছিল, যিনি সদ্য মারা গেছেন। সেদিন পত্রিকায় একটি ছবি প্রকাশ করেছিল, তার ডেস্কের একটি ছবি, উপরে একটি অসমাপ্ত বই। ক্যাপশনে বলা হয়েছে যে আমাদের সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সেই বইটি শেষ করতে পারেননি। আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তিনি বইটি শেষ করতে পারলেন না? এত কঠিন কি হতে পারে যে একজন মহান বিজ্ঞানী শেষ করতে

পারল না? আমার কাছে এটি যে কোনো খুনের রহস্যের চেয়ে বড় রহস্য, যে কোনো ধাঁধার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। অবশেষে আমি জানতে পারলাম যে এই লোকটির নাম আলবার্ট আইনস্টাইন এবং তার অসমাপ্ত তত্ত্বটি ছিল পদার্থবিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রকে একটি মাত্র তত্ত্বে একত্রিত করা, যা সম্ভবত 1 ইঞ্চির বেশি লম্বা হবে না। বিষয়টা আমাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। আমার এই কল্পিত তত্ত্ব সম্পর্কে আরও জানতে হবে এবং কেন তিনি এটি শেষ করতে পারেননি। জীবিকার জন্য আজ সেটাই করি। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হওয়ার কারণে, আমার কাজ হল "সবকিছুর তত্ত্ব" খুঁজে বের করা। এই তত্ত্বের জন্য নেতৃস্থানীয় প্রার্থী হলো "স্ট্রিং তত্ত্ব", যা আমি জীবিকার জন্য করি।

প্রশ্ন : বিজ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্র অন্বেষণে আগ্রহী স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার কি কোনো পরামর্শ আছে?

মিচিও কাকু : আমি শিক্ষার্থীদের বলি যে আমরা সবাই জন্মগতভাবে বিজ্ঞানী। আমরা সকলেই ভাবছি যে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেন নক্ষত্ররা জ্বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারপরে শিক্ষার্থীদের জুনিয়র হাইস্কুলে "বিপদ বছর" আঘাত করে, তখন সেই কৌতূহল এবং বিস্ময়ের অনেকটাই হারিয়ে যায়। বিজ্ঞানকে বিরক্তিকর করে তোলা হয়েছে, শুধু মুখস্থ করার মতো একগুচ্ছ জিনিস দিয়ে, এবং আমরা লক্ষ লক্ষ তরুণ বিজ্ঞানীদের হারিয়ে ফেলছি। বিজ্ঞান সম্পর্কে এই সহজাত কৌতূহলকে লালন করতে হবে আমাদের শিক্ষকদেরকে। আমি শিক্ষার্থীদের বলি যে তারা যদি জুনিয়র হাইস্কুলের বছরগুলিকে নিরাপদে পার করে আসতে পারে, তবে তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য একটি প্রচেষ্টা আছে।

প্রশ্ন : আপনি উল্লেখ করেছেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো প্রযুক্তি এবং বায়োটেকনোলজি উদ্ভাবনের আসন্ন জোয়ারকে নেতৃত্ব দেবে। এই ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রয়োজন এরকম কোন ক্যারিয়ার আপনি কল্পনা করেন?

মিচিও কাকু : এই মুহূর্তে, বেকারত্ব নিয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে, তবুও হাস্যকরভাবে, বিজ্ঞানে প্রচুর চাকরি রয়েছে যা অপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, আমরা তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য সমস্ত খালি পদ পূরণ করতে পারি না, তাই আমাদের বিদেশ থেকে নিয়োগ করতে হবে। তাই সেখানে প্রচুর চাকরি রয়েছে, বিশেষ করে কম্পিউটার ক্ষেত্র এবং ওষুধে। মনে রাখবেন, পৃথিবী কম বিজ্ঞানসম্মত হচ্ছে না। এটি আরও বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠছে। তাই এমনকি বিজ্ঞান বহির্ভূত চাকরির জন্য কম্পিউটার এবং জীববিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক জ্ঞান প্রয়োজন।

প্রশ্ন : আপনি ভবিষ্যত ক্যারিয়ারের প্রয়োজন হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এমন ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্কুল গুলোর কী করা উচিত?

মিচিও কাকু : শিক্ষার্থীদেরকে এসব ক্ষেত্রে গাইড করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রায়শই, শিক্ষার্থীরা এই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে শিক্ষকদের চেয়ে বেশি জানতে পারে। বেশিরভাগ স্কুলকেই তহবিল নিয়ে লড়াই করতে হয়, সমস্ত শিক্ষার্থীদের সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাগুলি সরবরাহ করার জন্য।

প্রশ্ন : কিছু কম খরচের উপায় কী আছে যা স্কুলগুলি পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করতে সাহায্য করতে পারে এবং তাদের এমন সব ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করতে পারে, যেগুলোর এখনও আবির্ভাব ঘটেনি?

মিচিও কাকু : যে কেউ ওয়েব থেকে প্রায় বিনামূল্যে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্স ডাউনলোড করতে পারেন। আর শিক্ষার্থীরা যাতে এসব বিষয় ভালো করে বুঝছে পারে, সেজন্য শিক্ষকরা তাদের সাথে মেন্টর হিসেবে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, আরও বেশি সংখ্যক ই-কোর্স ভবিষ্যতের মৌলিক কোর্স সামগ্রী সরবরাহ করবে, যেখানে শিক্ষকরা হবেন মেন্টর। শিক্ষকরা ক্যারিয়ার নির্দেশিকা, গ্রেড হোমওয়ার্ক প্রদান করবেন, উৎসাহ দেবেন।

প্রশ্ন : বিজ্ঞান কোর্সে শিক্ষকদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কি উপকৃত হবে?

মিচিও কাকু : আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন সমস্ত বিজ্ঞানের বাচ্চাদের বেল্টে স্লাইডের নিয়ম ছিল। এটি একটি তরবারির মতো ছিল, একটি সাহসের ব্যাজ। এর মানে আপনি বিজ্ঞানীদের কাতারে প্রবেশ করছেন। আমি যখন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছিলাম, তখন অধ্যাপকদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষার কক্ষে ক্যালকুলেটর নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের স্লাইডের নিয়ম অনুসরণ করাতে চেয়েছিল। অন্যান্য অধ্যাপকরা ভেবেছিলেন যে এটি বোকামি ছিল, যেহেতু প্রত্যেকেই ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে এবং স্লাইডের নিয়মগুলিতে অদক্ষ এবং প্রতিকূলে ছিল। আজ আপনি একটি স্লাইড নিয়ম দেখতে পারেন শুধুমাত্র একটি জাদুঘরে। এখনকার সময়ে অনেক শিক্ষার্থী এমনকি একটি স্লাইড নিয়ম সম্পর্কে কখনো শোনেইনি। এ থেকে শিক্ষাটি হলো : অতীতকে আঁকড়ে ধরে না থেকে বৈজ্ঞানিক নীতি শেখানোর জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করুন। আজ, আমরা স্নাতক শিক্ষার্থীরা ১৯৫০ সালে ভালোভাবে জীবনযাপন করতাম। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা এখন আর ১৯৫০ সালে বাস করি না। উদাহরণস্বরূপ, এমআরআই স্ক্যান, সিএটি স্ক্যান, পিইটি স্ক্যান, সাইবার সার্জারি এবং উন্নত জেনেটিক্সের পরিবর্তে লিভার, পুলি, ঘর্ষণ, টিউনিং ফর্ক ইত্যাদি ব্যবহার করে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের পদার্থবিদ্যা শেখানো হয়। আসলে, একজন ডাক্তারের অফিস আজ একটি উন্নত পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের মতো। সুতরাং, আমাদের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে হবে যাতে এটি অতীতের নয়, ভবিষ্যতের বিশ্বকে প্রতিফলিত করে। এরপরে, আমাদেরকে নীতি ও ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান শেখাতে হবে, মুখস্থ নয়। আমার প্রিয় আইনস্টাইনের উদ্ধৃতিটি হলো, “যদি একটি তত্ত্ব একটি শিশুকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহলে তত্ত্বটি সম্ভবত অকেজো।“ অন্য কথায়, মহান তত্ত্বগুলি সাধারণ ছবি, নীতি এবং ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় যা এমনকি শিশুরা বুঝতে পারে। শুধু বিশুদ্ধ বীজগণিতের তৈরি নয়, যা প্রায়শই অকেজো।

অনুবাদক :
সম্পাদক, গ্রাভিটন;
প্রেসিডেন্ট, ফ তে Physics ;
শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

ফিচার ৩

পারমাণবিক ঘড়ি

সময়ের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রহরী

ফজলে রাব্বি

পারমাণবিক ঘড়ি হল একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সময় পরিমাপক যন্ত্র, যা পরমাণুর নিজস্ব কম্পনের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। এই ঘড়িগুলি এত নির্ভরযোগ্য যে সেগুলি বিশ্বের সময় পারিমাপের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পারমাণবিক ঘড়ির ধারণাটি প্রথম উঠে আসে ১৯৪০ এর দশকে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে পরমাণু একটি নির্দিষ্ট হারে কম্পন করে এবং এই কম্পনকে ব্যবহার করে সময় পরিমাপ করা সম্ভব। ১৯৫৫ সালে প্রথম পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করা হয়, যেটি সিজিয়াম-১৩৩ পরমাণুর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। সেই থেকে পারমাণবিক ঘড়ির প্রযুক্তি ক্রমাগত উন্নতি হয়ে চলেছে এবং আজ এটি বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সময় পরিমাপক যন্ত্র।

কিন্তু, কিভাবে এই চমৎকার পারমাণবিক ঘড়িগুলো কাজ করে? পারমাণবিক ঘড়িগুলি একটি নির্দিষ্ট ধরনের পরমাণু, যেমন সিজিয়াম-১৩৩, ব্যবহার করে। সিজিয়াম-১৩৩ ছাড়াও অন্যান্য পরমাণু, যেমন সিজিয়াম, রুবিডিয়াম, হাইড্রোজেন ইত্যাদির বিভিন্ন আইসোটোপ ব্যবহার করে পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পরমাণু ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করা হয়, যাদের নির্ভুলতা, আকার, এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এই পরমাণুগুলি একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের সাথে যোগাযোগ করে। যখন মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরমাণুর নিজস্ব কম্পনের সাথে মিলে যায়, তখন পরমাণুগুলি একটি নির্দিষ্ট শক্তি অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের হারকে গণনা করে পারমাণবিক ঘড়ি সময় পরিমাপ করে।

পারমাণবিক ঘড়ির সুবিধাগুলি কি কি? পারমাণবিক ঘড়ির অনেক সুবিধা আছে। এগুলো হলো –

- অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য : পারমাণবিক ঘড়িগুলি এত নির্ভরযোগ্য যে সেগুলি বিশ্বের সময় পরিমাপের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি এত সঠিক যে সেগুলি বিজ্ঞানীরা মহাকাশে সময় পরিমাপ করতে ব্যবহার করে।
- স্থায়ী : পারমাণবিক ঘড়িগুলি তাপমাত্রা, চাপ বা অন্যান্য পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাব থেকে প্রায় অপ্রভাবিত থাকে। এগুলি এত স্থায়ী যে সেগুলি বিমান, জাহাজ এবং স্যাটেলাইটে ব্যবহৃত হয়।
- সঠিক : পারমাণবিক ঘড়িগুলি এত সঠিক যে সেগুলি বিজ্ঞানীরা মহাকাশের দূরত্ব পরিমাপ করতে ব্যবহার করে। এগুলি এত সঠিক যে সেগুলি GPS সিস্টেমগুলি সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করতে ব্যবহার করে।

পারমাণবিক ঘড়িগুলো কি কি কাজে, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?পারমাণবিক ঘড়িগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন–

- GPS সিস্টেম : GPS সিস্টেমগুলি সঠিক অবস্থান নির্ধারণের জন্য পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহার করে। এগুলি বিমান, জাহাজ, এবং গাড়িগুলির নেভিগেশন সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।
- বৈজ্ঞানিক কাজে : বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহার করে মহাকাশে সময় পরিমাপ করে। এগুলি বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণ করতে ব্যবহার করে। অনেক ক্ষুদ্র সময় নিখুঁতভাবে মাপতে বিজ্ঞানীরা এটা ব্যবহার করেন।
- সময়ের মানদণ্ড : পারমাণবিক ঘড়িগুলি বিশ্বের সময়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সময় অঞ্চলগুলি সমন্বয় করতে এবং বিশ্বব্যাপী সময়কে সঠিক রাখতে ব্যবহৃত হয়

পারমাণবিক ঘড়ির ভবিষ্যত

পারমাণবিক ঘড়িগুলির ভবিষ্যত উজ্জ্বল। বিজ্ঞানীরা আরও নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি করার জন্য কাজ করছে। এই ঘড়িগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, যেমন, মহাকাশ অনুসন্ধান, যোগাযোগ এবং সময় পরিমাপ।
পারমাণবিক ঘড়ি হল একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক সময় পরিমাপক যন্ত্র। এই ঘড়িগুলি বিশ্বের সময়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক ঘড়িগুলির ভবিষ্যত উজ্জ্বল, এবং আমরা আশা করি যে এই ঘড়িগুলি আরও নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক হবে।

লেখক :
শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

একটি অনুরোধ

পদার্থবিজ্ঞানের প্রসারে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকি। এসব কাজ করতে গিয়ে আমাদের আর্থিক ব্যয় হয়। আমাদের একটি ফান্ড আছে। এই ফান্ডে আপনাদের হতে প্রাপ্ত অনুদানে আমরা আমাদের কার্যক্রম আরও ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব! আমরা একটি অলাভজনক সংস্থা। আমাদের পরিচালনা কমিটির সদস্যরা অধিকাংশ কার্যক্রমে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। কিন্তু, সবাই শিক্ষার্থী হওয়াই বেশি বড় উদ্যোগ নিতে পারি না। তাই, সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিকাশ নম্বর: 01924313102

বইয়ের জগতে ফিজিক্স

বইয়ের নাম: সিক্স ইজি পিসেস
Book Name: Six Easy Pieces
লেখক: রিচার্ড ফাইনম্যান

রিভিউ লেখক:
মো: মখদুম আমিন ফাহিম

রিচার্ড ফাইনম্যান অনেক বিখ্যাত অনেক পদার্থবিদ। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অদ্ভুত ভূতুরে জগৎ গড়ে তুলতে যে সকল পদার্থবিদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তার মধ্যে তিনি অন্যতম। তার কল্যাণে কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রডাইনামিক্স গড়ে উঠেছে। যার জন্য তিনি ১৯৬৫ সারে জুলিয়ান সুইংগার ও সিন্টিরিয়ো টোমোনাগার সাথে যৌথ ভালো পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পান। তার ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম কণাদের মিথষ্ক্রিয়া বোঝাকে অনেক সহজ করে তুলেছে। তাকে পদার্থবিজ্ঞানের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকও বলা হয়। তিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ সালে পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলোজি (ক্যালটেক) এ লেকচার দেন। তার এই লেকচার পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনে। তার এই লেকচার থেকে পরবর্তীতে "The Feynman Lectures in Physics" সংকলন। এই সিরিজের তিনটি ভলিউম আছে। বইগুলোতে চমৎকারভাবে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়গুলো উপস্থাপন করা, যা পদার্থবিদ্যাপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই তিনটি বইকে অনেকে "বাইবেল অব ফিজিক্স"ও বলেন। এখান থেকে সবচেয়ে সহজ ৬টি অধ্যায় নিয়ে সংকলন করা হয়ে "Six Easy pieces"। এর ৬টি অধ্যায় হলো :

1. Atoms in Motion
2. Basic Physics
3. The Relation of Physics to Other Sciences
4. Conservation of Energy
5. The Theory of Gravitation
6. Quantum Behaviour

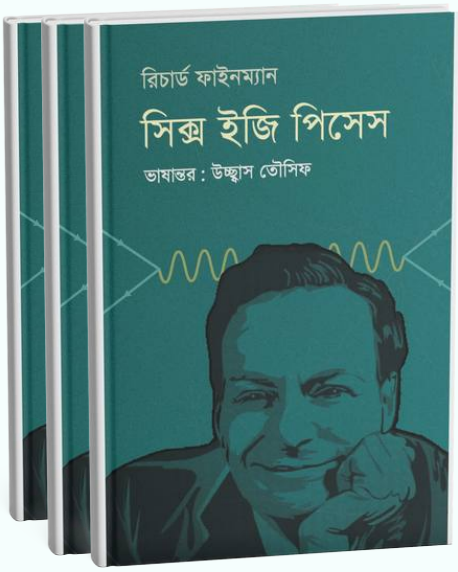

এই ৬টি অধ্যায় ফাইনম্যান লেকচার সিরিজের প্রথম ভলিউম থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রথম চারটি অধ্যায় হলো ভলিউমটির প্রথম চারটি অধ্যায় আর পঞ্চম অধ্যায় হলো ভলিউমটির সপ্তম অধ্যায় আর ষষ্ঠ অধ্যায়টি ভলিউমের ৩৭তম অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ে পরমাণু সম্পর্কে বলা হয়ে। পরমাণু ও অণুর গতির কথা এখানে বলা হয়েছে

পদার্থের তিনটি অবস্থার ধারণা এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে। চাপ, ঘনত্ব, তাপ, তাপমাত্রা ইত্যাদি মধ্যেকার সম্পর্কের কথা অতি সহজভাবে কোনো গাণিতিক সূত্র ব্যবহার না করে বোঝানো হয়েছে। অণুগুলো বাতাসে বা পানির পৃষ্ঠে বিভিন্ন অণু কিভাবে থাকে ধারণা দেওয়া হয়েছে। কিভাবে লবণের অণু পানিতে দ্রবীভূত হয়, লবণের স্ফটিকে সোডিয়াম ও ক্লোরিন কিভাবে অবস্থান করে, কিভাবে কার্বন পুড়ে কার্বনজাত বিভিন্ন অক্সাইড সম্পর্কে বলা হয়েছে। ওডোর অফ ভাইয়োলেটস, আলফা আয়রন ইত্যাদি বৃহৎ ও জটিল অণুর কথা বলা হয়েছে। আণবিক ও পারমাণবিক পর্যায়ের বিভিন্ন ঘটনা ও প্রক্রিয়া সহজ সাধারণভাবে ও চিত্রের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে, যা সহজে যে কেউ বুঝতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে এবং পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে কিভাবে প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করা হয় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১৯২০ সালের আগে পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থা এবং ১৯২০ সালের পরে পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। কণাদের কোয়ান্টাম জগতেরও ধারণা দেওয়া হয়েছে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পদার্থবিজ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের সাথে জীববিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে শক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। শক্তির ধারণা, শক্তি সংরক্ষণশীলতা, মহাকর্ষীয় বিভব শক্তি, গতিশক্তি ও শক্তির অন্যান্য রূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে কয়েকটি সূত্রও দেখানো হয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট প্রবলেমও দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে মহাকর্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র এবং কেপলারের সূত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। মহাজাগতিক বস্তুর গতি, দ্বৈত নক্ষত্র সিস্টেম, ক্যাভেন্ডিস পরীক্ষণ ও আপেক্ষিকতা নিয়ে বলা হয়েছে এখানে।

ষষ্ঠ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্স সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে কণা-তরঙ্গ দ্বৈত ধর্ম, ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট, সম্ভাবনা, অনিশ্চিতার নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন থট এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বিষয়গুলো বোঝানো হয়েছে।

বইটি এক কথায় চমৎকার একটি বই। যারা স্কুলের ফিজিক্স বই পড়ে ফিজিক্সের বিষয়গুলো বোঝে না, তারা সহজেই বইটি পড়ে বুঝতে পারে। ফিজিক্সের যে বিষয়গুলো স্কুলে বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র ও সমীকরণ দিয়ে কঠিনভাবে বোঝানো হয়। যেগুলোকে তিনি অনেক সহজভাবে, বাস্তব উদাহরণ, চিন্তা, কল্পনার মাধ্যমে অতি সহজে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠকদের যারে কল্পনা করতে সুবিধা হয়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট ছবিও দেওয়া হয়েছে। বইটি পদার্থবিজ্ঞানপ্রেমীদের অবশ্যই পড়া উচিত।

বইটি অনলাইন বিভিন্ন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ও বুকশপে পেয়ে যাবেন। ঢাকার নীলক্ষেতসহ বিভিন্ন বিখ্যাত বইয়ের দোকানে বইটি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে। কয়েকজন বাংলাদেশী লেখক ও অনুবাদ বইটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছে। যাদের ইংরেজিতে পড়তে কষ্ট হয়, তারা বইটির বাংলা অনুবাদ পড়ে নিতে পারেন।

রিচার্ড ফাইনম্যানের আরও অনেক বিখ্যাত বই আছে। তার যেমন “Six Easy Pieces” আছে, তেমনি “Six Not-So-Easy Pieces”ও আছে, যেখানে মূলত ভেক্টর, আপেক্ষিকতা, স্থান-কাল, প্রতিসাম্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই বইটি গণিতের ব্যবহার একটু বেশি, তবে বেশ ইন্টারেস্টিং একটা বই।

রিভিউ লেখক:
সম্পাদক, গ্রাভিটন;
প্রেসিডেন্ট, ফ তে Physics ;
শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

ফিচার ৪

ভেরা রুবিন
ডার্ক ম্যাটারের জননী

সুরাইয়া রাত্রি অর্নি

ভেরা ফ্লোরেন্স কুপার রুবিন ছিলেন একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি গ্যালাক্সির ঘূর্ণন ও ডার্ক ম্যাটার নিয়ে অনেক কাজ করেছিলেন। ভেরা রুবিন ১৯২৮ সালের ২৩ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি সপরিবারে ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে যান। দশ বছর বয়সী ভেরা তার জানালা থেকে তারা দেখার সময় জ্যোতির্বিদ্যায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

14 বছর বয়সে তিনি তার বাবার সাথে প্রথম টেলিস্কোপ তৈরি করেছিলেন। সে অল্প বয়সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে আমরা একটি খুব কৌতূহলী বিশ্বে বাস করি। ভেরা রুবিন 150 টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি কেন্ট ফোর্ড, রিচার্ড ফাইনম্যান, জর্জ গ্যামোর মতো বিখ্যাত পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদদের সান্নিধ্যে ছিলেন ও কাজ করেছেন। তার স্নাতক অধ্যয়নের সময়, তিনি 109টি ছায়াপথের গতি অধ্যয়ন করেন এবং হাবল প্রবাহ থেকে বিচ্যুতির প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন (কীভাবে ছায়াপথগুলি চলে একে অপরের থেকে আলাদা)। ভেরা কুপার রুবিন 1970 এর দশকে সুস্পস্ট পর্যবেক্ষণমূলক প্রমান তৈরি করেছিলেন যা অবশেষে বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিশ্চিত করেছিল যে মহাবিশ্বের বিশাল বিশাল অংশ অদৃশ্য এবং মূল চরিত্রে অজানা ডার্ক ম্যাটার দিয়ে তৈরি করা হয়। মহাবিশ্ব ছেয়ে আছে এমন ধরণের অদৃশ্য পদার্থে, যার অস্তিত্বের স্বপক্ষে অনেক প্রমানই আছে। কিন্তু যাকে কোনোভাবেই দেখা বা অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের সাহয্যে অনুধাবন করার উপায় নেই একটুও। অথচ ইদানীংকার হিসেব বলছে মহাবিশ্বের মোট ভরের প্রায় ৮৪ শতাংশ ভর এই অদৃশ্য পদাখের জন্যই।

আমরা যেমন এক বিরাট বাতাসের চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবে রয়েছি অথচ সেই চৌবাচ্চার মধ্যে ডুবে থাকাটা একেবারেই বুঝাতে পারিনা, ঠিক তেমনই মহাবিশ্ব পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে আছে এক অদৃশ্য সর্বত্রব্যাপী পদার্থের মধ্যে, যার নাম ডার্ক ম্যাটার। একে বাংলায় অনেকে গুপ্তবস্তু বলে। দৃশ্যমান বস্তুর ভেতর দিয়েও

ভেদ করে যেতে পারে অনায়াসে, এমন সর্বব্যাপী এই বস্তু নিয়ে তাই বিজ্ঞানীদের মাথাব্যাথা থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক আর যারা মহাবিশ্বের গঠন বা এর বিবর্তন নিয়ে গবেষণ করে চলেছেন, তাদের কাছে এ বস্তুর আকর্ষণ আরও বেশি কারণ এই বস্তুর উপস্থিতি প্রভাব ফেলে গ্রহ নক্ষত্রের গতি বা একটা গ্যালাক্সি অন্য গ্যালক্সিকে কীভাবে আকর্ষণ করছে, সেরকম সব ঘটনার ক্ষেত্রেও।

তিনি ছায়াপথ সমূহের ঘূর্ণনের হারের উপরে সর্বাগ্রগামী গবেষণাকর্মের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি ছায়াপথের ঘূর্ণনের বক্ররেখাগুলি অধ্যায়ন করে ছায়াপথগুলির পূর্বাভাসকৃত কৌণিক গতি এবং পর্যবেক্ষণকৃত গতির মধ্যকার বিচ্যুতি বের করেন। এই ঘটনাটি ছায়াপথ ঘূর্ণন সমস্যা নামে পরিচিতি লাভ করে। যদিও রুবিনের গবেষণার ফলাফল প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছিল, এর পরবর্তী দশকগুলিতে সেগুলি নিশ্চিত করে প্রমানিত হয়। মার্কিন দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস- এর মতে ভেরা বিশ্বতত্ব ক্ষেত্রে নিকোলাস কোপার্নিকাস মাপের একটি পরিবর্তন এনেছিলেন।

ভেরা রুবিন তার বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য এক ডজনেরও বেশি পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কারগুলির মধ্যে ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স, বিজ্ঞানের জাতীয় পদক এবং রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। রুবিন কখনো নোবেল পুরস্কার পাননি, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যায় তার অবদান চিরস্মরণীয়। ২০১৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর মাত্র ৮৮ বছর বয়সে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির প্রিন্সটনে মারা যান। ডার্ক ম্যাটার আবিষ্কারে তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে "ডার্ক ম্যাটারের জননী" বলা হয়।

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, অ্যাস্ট্রোনমি ম্যাগাজিন, ব্রিটিশ অ্যাস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি,

লেখক:
Secretary of Women, ফ তে Physics;
শিক্ষার্থী, সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ

ফিচার ৫

কোয়ান্টাম মহাকর্ষের সন্ধানে

মোঃ মখদুম আমিন ফাহিম

প্রাচীনকাল থেকেই মহাকর্ষ মানুষের কাছে একটি রহস্য। পৃথিবী কেন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে? চাঁদ কেন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে? মানুষ বহুকাল ধরে এসব প্রশ্নের খুঁজছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন তত্ত্ব দিকে মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এতে প্রথম সফলতা দেখা যায় আইজ্যাক নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকে, যেখানে তিনি মহাকর্ষকে বল হিসেবে দেখান। তিনি বলেন মহাবিশ্বের ভরযুক্ত প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। দুইটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল তাদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের দুরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, ভরযুক্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে মহাকর্ষ বল কাজ করে। এই বলের কারণে গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছু একে অপরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও নিউটনীয় বলবিদ্যা মহাকর্ষ ও মহাজাগতিক সবকিছু প্রায় সঠিক ভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু, পরবর্তীতে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। নিউটনের সূত্র বুধ গ্রহের কক্ষপথের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ব্লাকহোলের মতো বস্তুর ক্ষেত্রেও নিউটনের মহাকর্ষ আর কাজ করে না। এই সমস্যার সমাধান করে দেন আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা। তিনি মহাকর্ষে বিশেষ আপেক্ষিকতা প্রয়োগ করে এটি তৈরি করেন। সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুসারে মহাকর্ষ কোনো বল নয়, স্থান-কালের বক্রতা। নিউটনীয় বলবিদ্যায় সময় পরম এবং আমরা ত্রিমাত্রিক জগতে আছি। কিন্তু, আইনস্টাইন দেখান যে সময় পরম নয়, সময় আপেক্ষিক। আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকতা তত্ত্বে ত্রিমাত্রিক স্থান ও সময়কে একত্রিত করে চতুর্মাত্রিক স্থান-কালের ধারণা দেওয়া হয়েছে। এখানে সময়কে চতুর্থ মাত্রা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুসারে, ভর ও শক্তি তার চারপাশের স্থান-কালকে বাকিয়ে দেয়। ফলে স্থান-কালের বক্রতার সৃষ্টি হয়। পদার্থবিদ জন হুইলার বলেছেন, “স্থান-কাল পদার্থকে বলে কিভাবে চলতে হবে আর পদার্থ স্থান-কালকে বলে কীভাবে বাঁকতে হবে।“ অর্থাৎ, ভর ও শক্তি স্থান-কালকে প্রভাবিত করে নির্দেশ দেয় কীভাবে-কতটুকু বাঁকা হতে হবে। আর স্থান-কাল বস্তুকে প্রভাবিত করে নির্দেশ দেয় কিভাবে-কোন পথ দিয়ে চলতে হবে। সাধারণ আপেক্ষিক মহাকর্ষকে অনেক ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা এখনও স্বস্তি পাইনি।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যেই দুটি স্তম্ভের ওপর দাড়িয়ে আছে, তার একটি হলো আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আর অপরটি হলো কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। একটি বৃহৎ স্কেলে কাজ করে আর অপরটি ক্ষুদ্র স্কেলে। প্রকৃতির ৪টি মৌলিক বলের মধ্যে তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, সবল নিউক্লিয়ার বল ও দুর্বল নিউক্লিয়ার বল –এই ৩টি ব্যাখ্যা করা যায় কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি দিয়ে।

কিন্তু, মহাকর্ষ বল কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মহাকর্ষ বল ব্যাখ্যা করা হয় আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দিয়ে। প্রকৃতির মৌলিক বলগুলো ব্যাখ্যায় ভিন্নধর্মী এই দুটি তত্ত্বের ব্যবহার পদার্থবিজ্ঞানীদের জন্য বেশ অস্বস্তিকর ব্যাপার। কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর সাংঘর্ষিক। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অনিশ্চয়তা আছে। এটা সম্ভাবনার জগৎ। এখানে কণাগুলোর তরঙ্গ দশা আছে। এর বলবিদ্যা ব্যাখ্যা করতে ওয়েভ ফাংশন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু, আপেক্ষিকতায় কোনো অনিশ্চয়তা নেই। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অবস্থান, ভরবেগ, শক্তি, স্পিন ইত্যাদি নিরবচ্ছিন্ন(Quantized), কিন্তু আপেক্ষিকতায় সেগুলো নিরবচ্ছিন্ন নয়। আবার আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম মেকানিক্সে সময়কেও ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। আবার, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে স্থান-কালকে ফ্ল্যাট(Flat) ধরা হলেও আপেক্ষিকতায় স্থান-কাল বক্র হতে পারে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর আপেক্ষিকতার গণিতেও বেশ পার্থক্য রয়েছে। এই বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যের জন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রায়ই বিভিন্ন ঝামেলা পোড়াতে হয়।

পদার্থবিজ্ঞানে একত্রীকরণ(Unification) খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। পদার্থবিজ্ঞান হলো প্রকৃতির বিজ্ঞান। এই পুরো মহাবিশ্বের সবকিছু জানার ও বোঝার চেষ্টা করা হয় পদার্থবিজ্ঞানে। সকল রহস্য সমাধান করা হয়। রসায়ন ও জীববিজ্ঞানও মূলত পদার্থবিজ্ঞানেরই বিস্তৃত রূপ। প্রকৃতির সকল কিছু একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। তাই, পদার্থবিজ্ঞানীরা সবসময় চেষ্টা করে পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব-সূত্র সবকিছুকে একত্রিত করতে। পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম সবচেয়ে বড় একত্রীকরণ করেন আইজ্যাক নিউটন। কিন্তু, মহাকর্ষের মধ্যমে পৃথিবী ও মহাজাগতিক বস্তুসমূহের গতিকে একত্রিত করেন। এরপরের জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ইলেক্টিসিটি এবং ম্যাগনেটিজমকে একত্রিত করে ইলেক্ট্রম্যাগনেটিজম করে। এরপর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম ও দুর্বল নিউক্লিয়ার বলকে একত্রিত করে ইলেক্ট্র-উইক থিওরি করা হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের সবকিছু যদি আমরা একত্রিত করতে পারি, তাহলে পাব থিওরি অব এভরিথিং।

পদার্থবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বের খোঁজেই ছুটছে। এই তত্ত্ব পাওয়া গেলে মহাবিশ্বের সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। পদার্থবিজ্ঞানে একত্রিকরণে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও আপেক্ষিকতাকে একত্রিত করা। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর আপেক্ষিকতার একত্রিত রূপই হলো কোয়ান্টাম গ্রাভিটি।

কোয়ান্টাম গ্রাভিটিতে মূলত কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করা হয়। মহাবিশ্বের অনেক বিষয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং রিলেটিভিটি দুটোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব বিষয়ের এখনো পর্যন্ত সঠিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাইনি। এগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য কোয়ান্টাম গ্রাভিটির প্রয়োজন হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্লাকহোল, বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটি, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি, কসমোলজিক্যাল ধ্রুবক ইত্যাদি। মৌলিক কণাদের স্পিনের ফলে মহাকর্ষ সৃষ্টির রহস্যও উন্মোচিত হবে। এটা নিউট্রন স্টার, কোয়ান্টাম ইনফরমেশন, কনডেন্স ম্যাটার ফিজিক্স সহ অনেক ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখবে। কোয়ান্টাম গ্রাভিটি ছাড়া পদার্থবিজ্ঞান সম্পূর্ণতা পাবে না, অপূর্ণ রয়ে যাবে।

কোয়ান্টাম গ্রাভিটির জন্য বিভিন্ন পদার্থবিদ বিভিন্ন তত্ত্বের প্রস্তাব দিয়েছে বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছে। কোয়ান্টাম গ্রাভিটির ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হলো অন্যান্য বলের ক্ষেত্রে যেরকম বাহক কণা পাওয়া গেছে, এর সেরকম কোনো বাহক কণা পাওয়া যায়নি। তবে, তাত্ত্বিকভাবে একটি কণার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়, যার নাম গ্রাভিটন। এই গ্রাভিটন অতিক্ষুদ্র। এটি ভরহীন কণা। এর আকার হয়তো প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি, সেজন্য হয়তো হয়তো এটাতে চিহ্নিত করা যায়নি। প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের মান প্রায় 1.616255×10^{-35} মিটার,

যা প্রোটনের আকারের 10^{20} ভাগের একভাগ। এত ক্ষুদ্র কণা চিহ্নিত করার মতো কোনো যন্ত্র বর্তমানে মানুষের কাছে নেই। এত ক্ষুদ্র কণা চিহ্নিত করতে অনেক বিশাল কণা-ত্বরক যন্ত্র এবং প্রচুর শক্তির প্রয়োজন, যা বর্তমানে প্রযুক্তিতে সম্ভব নয়। স্ট্রিং থিওরিও একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব। স্ট্রিং থিওরিতেও গ্রাভিটনের কথা বলা হয়। স্ট্রিং থিওরি অনুসারে, সকল কণায় স্ট্রিং এর তৈরি। বিভিন্ন রকমভাবে স্ট্রিংগুলো কম্পিত হওয়ায় বিভিন্ন কণার সৃষ্টি হয় হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে, গ্রাভিটনও হলো স্ট্রিং এর নিদিষ্ট কম্পনের ফলে তৈরি কণা, যা মহাকর্ষের জন্য দায়ী। সুপার গ্রাভিটি দিয়েও মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুপার গ্রাভিটি মূলত কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি যেখানে সুপার সিমেট্রি ব্যবহার করে মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করা হয়। সুপার সিমেট্রি মূলত স্ট্যান্ডার্ড মডেলে বিস্তৃত রূপ, যেখানে প্রতিসাম্যতা ব্যবহার করে তাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন কণার অস্তিত্বের কথা হয়। কোয়ান্টাম গ্রাভিটির আরেকটি বিখ্যাত তত্ত্ব হলো লুপ কোয়ান্টাম গ্রাভিটি। এই তত্ত্ব অনুসারে স্থান-কাল অসংখ্য অতিক্ষুদ্র সসীম লুপের সমন্বয়ে গঠিত। এই লুপগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যাকে স্পিন নেটওয়ার্ক বলে। কোয়ান্টাম গ্রাভিটির আরেকটি তত্ত্ব হলো হলোগ্রাফিক ডুয়ালিটি। এই তত্ত্বে মহাকর্শকে নিম্ন মাত্রিক হলোগ্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এছাড়াও আরও বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে, যেগুলো কোয়ান্টাম গ্রাভিটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। তবে, কোনো তত্ত্বই আজ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়নি।

কোয়ান্টাম গ্রাভিটি নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা মূলত এখন চলছে। এটা নিয়ে বাস্তবে পরীক্ষা করা অনেক কঠিন কাজ। মৌলিক কণাদের মহাকর্ষ বলের প্রভাব অনেক দুর্বল হওয়াই তা নির্ণয় করার সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে হয়তো শক্তিশালী কণা-ত্বরক যন্ত্র দিয়ে গ্রাভিটন কণা শনাক্ত করা যেতে পারে। দুইটি ব্লাকহোলের সংঘর্ষে সৃষ্ট মহাকর্ষ তরঙ্গে থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কোয়ান্টাম গ্রাভিটির যদি সঠিক তত্ত্ব পাওয়া যায়, তাহলে মহাবিশ্বের অনেক রহস্য উন্মোচিত হবে।

তথ্যসূত্র :
উইকিপিডিয়া, ব্রিটানিকা, সার্ন, স্পেস ডট কম, এমআইটি

লেখক :
সম্পাদক, গ্রাভিটন;
প্রেসিডেন্ট, ফ তে Physics ;
শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

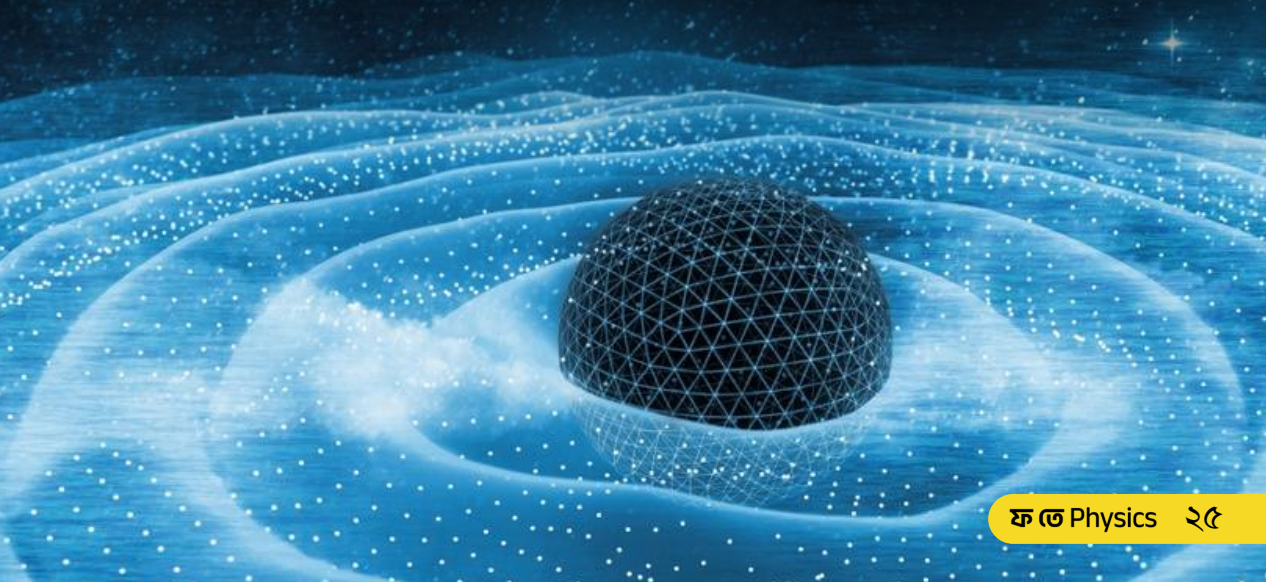

মুভিতে ফিজিক্স

লোকি : সময়ের দেবতা

সিমরান মাহমুদ

“সময় ভেঙে গেছে। আর এখন... বিশৃঙ্খলা নেমে এসেছে। লোকি আর সিলভি “হি হু রিমেইন্স”-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের রেখা ভেঙে গিয়ে অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হচ্ছে! ”

“তারা ভেবেছিল, বহুবিশ্বকে মুক্ত করেছে। কিন্তু তারা যা মুক্ত করেছিল... তা ছিল আরও ভয়ঙ্কর কিছু।”

“লোকি ছুটে চলেছে ভেঙে পড়া টাইমলাইনগুলোর মধ্য দিয়ে, নিজের বিভিন্ন সংস্করণের সামনে দিয়ে দৌড়াচ্ছে, শহরগুলো ধ্বংস হচ্ছে, আর ছায়া থেকে অজানা শক্তিগুলো দেখছে।”

“লোকি এখন অসংখ্য ভেঙে যাওয়া বাস্তবতার মাঝে আটকে আছে, অজানা শত্রুদের দ্বারা তাড়া খাচ্ছে... আর TVA? সেটা আর আগের মতো নেই।”

“মোবিয়াসের বিভ্রান্ত মুখ, TVA-এর মনিটরে অসংখ্য টাইমলাইনের বিশৃঙ্খল শাখা ছড়িয়ে পড়ছে।”

“নতুন শত্রুরা উঠে আসছে। পুরনো বন্ধুদের মনে নেই কিছুই। আর বহুবিশ্ব... ডুবে যাচ্ছে অরাজকতায়।”

“ক্যাং-এর বিভিন্ন সংস্করণগুলো ছায়া থেকে বের হচ্ছে, তাদের চোখে শক্তির ঝলক, আর লোকি আতঙ্কে তাকিয়ে আছে।”

“লোকি কি টাইমলাইনগুলোকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারবে, নাকি সে দেখবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে?”

“সময়ের যুদ্ধ শুরু হয়েছে... এবং এখানে কিছুই যেমনটা মনে হয়, তেমন নয়।”

এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড

কিসের TVA, কে ক্যান,কেন মহাবিশ্ব সংকটে কিছুই বুঝতে পারছেন না? শুরু থেকে শুরু করি লোকি সিজন ২ রিভিউ এর মাধ্যমে।

শুরু করার আগে বলে দিই এটি লোকি সিজন ২ এর একটি রিভিউ। তাই আমি এখানে কোন স্পইলার দিব না। হালকা কিছু স্পয়লার থাকবে যা আপনার মুভির এক্সপেরিয়েন্স নষ্ট করবে না ।আমি এই মুভিটি রিভিউ করতেছি কারণ এই মুভিতে অনেক প্যারাডক্স এবং টাইম ট্রাভেল সম্পর্কিত বিষয় আছে যা আপনাদের মধ্যে ফিজিক্স পড়তে, জানতে আগ্রহ দিবে বলে আমি মনে করি।

"Loki" Season 2 শুরু হয় যেখানে আমরা দেখি লোকি সময়ের মধ্যে একটি অদ্ভুত সমস্যা "টাইম-স্লিপিং"এর সম্মুখীন হচ্ছে। এটি এমন একটি ঘটনা যেখানে সে অজান্তে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে যাতায়াত করে, যা TVA (Time Variance Authority)-এর মধ্যে কখনোই সম্ভব হওয়া উচিত নয়, কারণ TVA সময় এবং স্থানের বাইরে থাকে। এই বিষয়টি আমাদের ইঙ্গিত দেয় যে, টিভিএ-র টাইমলাইন নিয়ন্ত্রণে বড় ধরনের সমস্যা

দেখা দিয়েছে। সিজন ১-এর শেষে সিলভি যখন "He Who Remains"-কে হত্যা করেছিল, তখন থেকে মাল্টিভার্সের শৃঙ্খলা ভেঙে গেছে, যার ফলাফল সিজন ২-তে এখন স্পষ্ট হচ্ছে।

টিভিএ-এর অবস্থা এখন অনেকটাই সংকটাপন্ন। এক সময় যেখানে টিভিএ সময়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখত, এখন সেখানে নানা নতুন টাইমলাইন গড়ে উঠছে এবং টিভিএ তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। "মোবিয়াস" এবং অন্যান্য TVA-এর এজেন্টরা এই ভাঙন ঠেকাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের চেষ্টা বিফলে যাচ্ছে। এতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, টিভিএ-র ভিতরে থাকা বিভিন্ন এজেন্টরাও নানা রকম দ্বিধায় ভুগছে—তাদের আসল উদ্দেশ্য কী এবং তারা এই বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে কীভাবে সামাল দেবে।

সিলভিও আবার ফিরে আসে, কিন্তু এবার সে নিজের কর্মকাণ্ডের ফলাফল নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে। সে মনে করেছিল TVA-র নিয়ন্ত্রণ ধ্বংস করে সবার জন্য মুক্ত ইচ্ছার সুযোগ করে দিচ্ছে, কিন্তু আসলে সে মাল্টিভার্সের জন্য বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। তার সাথে লোকির সম্পর্ক এখন বেশ জটিল। তারা কি একসাথে মাল্টিভার্সকে বাঁচাতে পারবে, নাকি তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে?

সিজন ২-তে মাল্টিভার্সের যুদ্ধের সম্ভাবনা আরও গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। He Who Remains-এর মৃত্যু মাল্টিভার্সের অন্যান্য টাইমলাইনগুলিকে বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন টাইমলাইনে "Kang the Conqueror"-এর ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ দেখা দিতে পারে, যা একটি বড় ধরনের সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এই মাল্টিভার্সের অস্থিতিশীলতা ভবিষ্যতের মার্ভেল সিনেমা যেমন “Avengers: The Kang Dynasty” এবং “Secret Wars”-এর জন্য একটি বড় ভিত্তি হতে পারে।

অন্যদিকে, লোকির চরিত্রের বিকাশও সিজন ২-এর মূল বিষয়গুলির মধ্যে একটি। সে নিজের স্বার্থপরতা এবং বৃহত্তর দায়িত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। সিজনের বিভিন্ন সময়ে আমরা লোকিকে নিজের ভিলেনসুলভ পরিচিতি থেকে বেরিয়ে এসে মাল্টিভার্স রক্ষার চিন্তা করতে দেখি। তার এই আত্ম-অন্বেষণ সিজনের গুরুত্বপূর্ণ থিমগুলির মধ্যে একটি।

"লোকি" সিজন ২-এর ভিজ্যুয়ালগুলি মার্ভেলের অন্যান্য সিনেমার সাথে সম্পৃক্ত নানা ইস্টার এগ এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়ে ভরপুর। এখানে অতীতের MCU ইভেন্টের অনেকগুলো রেফারেন্স, টিভিএ-এর ভবিষ্যত, এবং আসন্ন সিনেমাগুলির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

মুভিটি দেখার পরে আপনাদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে। আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

১. ইলিউশনস অ্যান্ড রিয়েলিটি (Illusions and Reality)

লোকি চরিত্রের ক্ষমতা হল বাস্তবতার ছদ্মবেশ তৈরি করা। ফিজিক্সের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কিভাবে আমরা বাস্তবতা উপলব্ধি করি তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। আলো, প্রতিফলন, এবং প্রতিসরণের মত প্রাকৃতিক ঘটনা কিভাবে আমাদের আশপাশের জগতকে প্রভাবিত করে তা "লোকি" তে প্রদর্শিত হয়। সিরিজে দেখা যায় লোকি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভ্রম তৈরি করেন, যা ফিজিক্সের আলো এবং ছায়ার ধারণা সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

২. টেলিপোর্টেশন অ্যান্ড স্পেস ট্রাভেল (Teleportation and Space Travel)

লোকি সিরিজে চরিত্ররা প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন স্থানান্তর বা পোর্টালের মাধ্যমে ভ্রমণ করে থাকে। ফিজিক্সের দৃষ্টিতে, এটি ওয়ার্মহোলের মত তাত্ত্বিক ধারণার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, যা স্পেস-টাইমের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে ভ্রমণের পথ দেখায়। যদিও বর্তমান বিজ্ঞান এমন প্রযুক্তিতে বাস্তবায়িত হয়নি, তবুও "লোকি" তে এটি একটি আকর্ষণীয় কল্পনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. ব্রাঞ্চিং টাইমলাইন্স অ্যান্ড দ্যা মাল্টিভার্স (Branching Timelines and the Multiverse)

"লোকি" সিরিজে মাল্টিভার্সের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফিজিক্সে, বিশেষ করে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে, মেনি-

ওয়ার্ল্ডস ইন্টারপ্রিটেশন (Many-Worlds Interpretation) বলে একটি তাত্ত্বিক ধারণা রয়েছে যেখানে প্রতিটি সম্ভাব্য ঘটনা একটি নতুন বাস্তবতা বা ব্রাঞ্চিং টাইমলাইন তৈরি করে। এই ধারনা সিরিজের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে, যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং ঘটনায় নতুন একটি বাস্তবতা গড়ে ওঠে।

৪. টাইম ট্রাভেল অ্যান্ড দ্য TVA (Time Travel and the TVA)

টাইম ট্রাভেল হল "লোকি" সিরিজের একটি মূল থিম, এবং টাইম ভেরিয়েন্স অথরিটি (TVA) এর মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফিজিক্সের দৃষ্টিকোণ থেকে, টাইম ট্রাভেল অনেক জটিল এবং তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি করে, যেমন টাইম প্যারাডক্সগুলো। আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব টাইম ডাইলেশনের ধারণাকে সমর্থন করে, যেখানে দ্রুতগতিতে চলা বস্তুগুলোর জন্য সময়ের প্রবাহ ধীরে হয়। "লোকি" তে TVA কিভাবে টাইমলাইনে হস্তক্ষেপ করে এবং সময়ের প্রবাহ বজায় রাখে তা এই তাত্ত্বিক ধারণার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

"লোকি" সিজন ২ ফিজিক্সের বিভিন্ন জটিল ধারণাকে সহজবোধ্য এবং মজারভাবে উপস্থাপন করে। ইলিউশনস থেকে শুরু করে মাল্টিভার্স এবং টাইম ট্রাভেল—এই সবকিছু একত্রিত হয়ে সিরিজটিকে একটি আকর্ষণীয় এবং চিন্তাশীল অভিজ্ঞতা দেয়। বিশেষ সায়েন্স ফিকশন যারা পছন্দ কর এবং পদার্থবিজ্ঞানপ্রেমীরা এটি দেখে অনেক রোমাঞ্চকর অনুভুতি পাবে, সাথে তাদের চিন্তা জগতেও বিভিন্ন বিষয় নাড়া দেবে।

লেখক :
শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

সায়েন্স ফিকশন ১

আগামীর প্রতিধ্বনি

প্রীতম বিশ্বাস

বছরটা ২১৫৭। মানবজাতি অবিশ্বাস্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল—মঙ্গল গ্রহে বসতি, স্বপ্ন দেখতে সক্ষম কৃত্রিম মস্তিষ্ক, এমন যন্ত্র যা একসময় অচিকিৎসাযোগ্য রোগের নিরাময় করেছিল। তবুও, এই সমস্ত উন্নতির পরেও, সময় ছিল একটুখানি অটল, অবিচল। কেউ তা বদলাতে পারত না, পেছনে ফিরিয়ে আনতে পারত না, কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। অন্তত, সবাই সেটাই বিশ্বাস করত।

যতক্ষণ না ড. ইলিয়াস রোয়ান সবকিছু বদলে দিলেন। রোয়ান ছিলেন একজন একাকী পদার্থবিদ, এমন এক ব্যক্তি যিনি পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে ছায়ায় কাজ করতেন। বহু বছর ধরে কেউ জানত না, তিনি কী নিয়ে কাজ করছেন, যতক্ষণ না একদিন তিনি তাঁর গোপন ল্যাব থেকে বেরিয়ে এসে এমন একটি ঘোষণা করলেন যা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিল: তিনি একটি টাইম মেশিন বানিয়েছেন।

প্রথমে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করতে চায়নি। ধারণাটা ছিল খুবই অবিশ্বাস্য, এমন এক যুগেও যখন মানুষ মঙ্গল গ্রহে বসবাস করে আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতোই কথা বলতে পারে। কিন্তু তারপর এল উন্মোচনের দিন—একটি চকচকে, কালো গোলক, যা আশেপাশের আলোকে শোষণ করছিল, এমনভাবে যেন এটি অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনি একে নাম দিলেন ‘ক্রোনোস’।

যে দিনটি ইতিহাসের সাক্ষী হবে, সেদিন পৃথিবী যেন শ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিল। বিশাল এক ল্যাবরেটরিতে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী এবং গণমাধ্যম একত্রিত হয়েছিল। রোয়ান একজন মানুষকে পাঠানোর পরিকল্পনা করেননি—না, এখনই নয়। এটা ছিল অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি একটি ছোট প্রোব পাঠাবেন, কেবল পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে। স্রেফ একটা পরীক্ষা, সাধারণ একটি পরীক্ষা।

“সময় সরলরেখায় চলে না,” রোয়ান জনতাকে বললেন। “এটা নদীর মতো, যা ক্রমাগত চলে, কিন্তু একে ঘোরানো, ধীর করা বা ত্বরান্বিত করা যায়—যদি আপনি জানেন কীভাবে সেটা করতে হয়।”

ছোট ধাতব ঘনক্ষেত্রটি, প্রোব, ‘ক্রোনোস’এ স্থাপন করা হয়। যন্ত্রটি ক্রমশ গম্ভীরভাবে গর্জন শুরু করল, এর পৃষ্ঠ চিকচিক করছে। তারপর, এক ঝলক আলো, এবং প্রোবটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘরটি একেবারে নিঃশব্দ ছিল। পাঁচটি মিনিট ধীরে ধীরে কেটে গেল, সবাই তাকিয়ে ছিল প্রোবটির ফাঁকা জায়গার দিকে। তারপর, আবার এক ঝলক, এবং প্রোবটি ফিরে এলো। জনতা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। রোয়ান সফল হয়েছিলেন।

কিন্তু যখন তিনি প্রোবটির দিকে এগোলেন, তখন কিছু একটা ঠিকঠাক মনে হলো না। একসময় যা ছিল

চকচকে ডিভাইস, তা এখন পোড়া এবং বিকৃত। আরও অস্বস্তিকর ছিল সেই ভিডিও ফুটেজ, যা এর যাত্রার সময় ধারণ করা হয়েছিল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল পৃথিবী—পরিচিত, কিন্তু আলাদা। আকাশ ছিল অস্বাভাবিক লাল, জমি ছিল উজাড়, এবং দূরে, কিছু একটা, বিশাল এবং অন্ধকার, দিগন্তের ওপারে চলছিল। একটা ছায়া, অসীম এবং রূপহীন।

রোয়ান দ্রুত ভিডিওটি বন্ধ করে দিলেন, এটাকে গ্লিচ বলে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সেই ছবি তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গেল। সেদিন রাতেই, যখন তিনি একা ল্যাবে ছিলেন, সেই ফুটেজ তিনি বারবার বাজাচ্ছিলেন। প্রোবটি কী দেখেছিল? এটা কি ভবিষ্যৎ ছিল? নাকি সমান্তরাল কোন জগত? তাঁর মাথায় হাজারো প্রশ্ন ঘুরছিল।

তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।

রোয়ান দরজা খুলতেই, তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন... তিনি নিজেই। তবে একটু বয়স্ক, ক্লান্ত, এবং ভয়ে ভরা চোখ।

“তোমাকে এটা থামাতে হবে,” বৃদ্ধ রোয়ান বললেন, কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। “তুমি জানো না, তুমি কী করেছো।”

রোয়ান চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ স্বত্তা বলতে লাগলেন,

ক্রোনোস এর প্রতীকী ছবি। Generated with Ideogram AI.

“প্রতিবার তুমি ‘ক্রোনোস’ ব্যবহার করো, তুমি টাইমলাইনকে ভেঙে ফেলো। নতুন নতুন শাখা তৈরি হয়—সমান্তরাল বাস্তবতা। আমি চেষ্টা করেছিলাম ঠিক করতে, কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। কিছু একটা... কিছু একটা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে।”

রোয়ান মাথা নাড়লেন, হতবুদ্ধি। “তুমি কী বলতে চাও? কী আসছে?”

“প্রতিধ্বনি,” ভবিষ্যতের রোয়ান ফিসফিস করে বললেন। “যেসব পৃথিবী কখনোই থাকা উচিত ছিল না, তাদের ফাটলের টুকরো। ওরা মানুষ নয়, ঠিক না। ওরা... সম্ভাবনার ছায়া, এবং ওরা শিখে নিয়েছে কীভাবে আমাদের জগতে আসতে হয়। ওরা আমাদের শিকার করছে, ইলিয়াস। ওরা আমাকে শিকার করেছে।”

এর আগেই রোয়ান কিছু বলতে পারলেন, ল্যাবের আলো ঝাপসা হতে লাগল। একটি গম্ভীর, অমঙ্গলের শব্দ বাতাস ভরে দিল। ‘ক্রোনোস’ যেন নিজে থেকেই চালু হয়ে গেল।

ভবিষ্যতের রোয়ান আতঙ্কে তাকিয়ে বললেন, “ওরা এসে গেছে।”

মেশিন থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল অবয়বগুলি। অন্ধকার, বিকৃত রূপ, প্রায় মানবীয়, কিন্তু ঠিক নয়। তাদের মুখগুলো ঝাপসা, হাত-পা লম্বা, এবং তাদের চলন অস্বাভাবিক। প্রতিধ্বনিগুলি এদিকেই চলে এল। বৃদ্ধ রোয়ান তাঁর তরুণ স্বত্তাকে বললেন, “যন্ত্রটি ধ্বংস করো! এটা একমাত্র উপায়!” কিন্তু এর আগে তিনি কিছু করতে পারেন, প্রতিধ্বনিগুলি তাঁকে ঘিরে ধরল, তাঁকে তাদের জগতে টেনে নিয়ে গেল, তাঁর চিৎকার বাতাসে হারিয়ে গেল। রোয়ান পিছিয়ে গেলেন, বুকের ধুকপুকানি বাড়ছিল। প্রতিধ্বনিগুলি এবার তাঁর দিকে তাকাল, তাদের ফাঁকা চোখের দৃষ্টি সরাসরি তাঁর দিকে। সময় যেন নিজেই বিকৃত হয়ে গেল, তাদের চারপাশে বাস্তবতা কাঁপছিল, যেন পৃথিবী তাদের ধরে রাখতে পারছে না। রোয়ান দৌড়ে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে গেলেন, কাঁপা কাঁপা হাতে সেল্ফ-ডেস্ট্রাক্ট বোতাম চাপলেন। যন্ত্রটি অতিরিক্ত গরম হতে লাগল, চারপাশে বিদ্যুৎ ছুটতে লাগল, শব্দ আরও জোরালো হতে লাগল। প্রতিধ্বনিগুলি চিৎকার করল, তাদের রূপ কেঁপে উঠছিল যখন ‘ক্রোনোস’ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছল। একটি ঝলমলে বিস্ফোরণের সঙ্গে, মেশিনটি উড়ে গেল

রোয়ান দেওয়ালে আছড়ে পড়লেন। যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন ল্যাব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ধোঁয়া বাতাস ভরিয়ে দিয়েছে, সর্বত্র ধ্বংসাবশেষ। 'ক্রোনোস' ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রতিধ্বনিগুলিও চলে গেছে।
কিন্তু কিছু একটা ঠিক ছিল না।
রোয়ান বাইরে এলেন, শীতল রাতের বাতাসে শ্বাস নিলেন। আকাশটা যেন অন্যরকম লাগছিল। তারাগুলি অন্যভাবে ছিল। নক্ষত্রমণ্ডলগুলো বদলে গেছে।
সময় ভেঙে গেছে।
এবং কোথাও, সেই ভাঙা বাস্তবতার ভেতরে,
প্রতিধ্বনিগুলি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপেক্ষা করছে। শিকার করছে।

রোয়ান আকাশের দিকে তাকালেন, ভয়ের স্রোত তাঁর মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি সময় নিয়ে খেলেছিলেন, এবং এর ফলাফল মাত্র শুরু হয়েছে। ভবিষ্যৎ শুধু একটা জায়গা নয়, যেখানে তুমি যেতে পারো—এটা এমন কিছু যা তোমাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আর এখন, সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে।

লেখক :
সহকারী শিক্ষক, হাজী ফয়েজ উদ্দিন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা

সায়েন্স ফিকশন ২

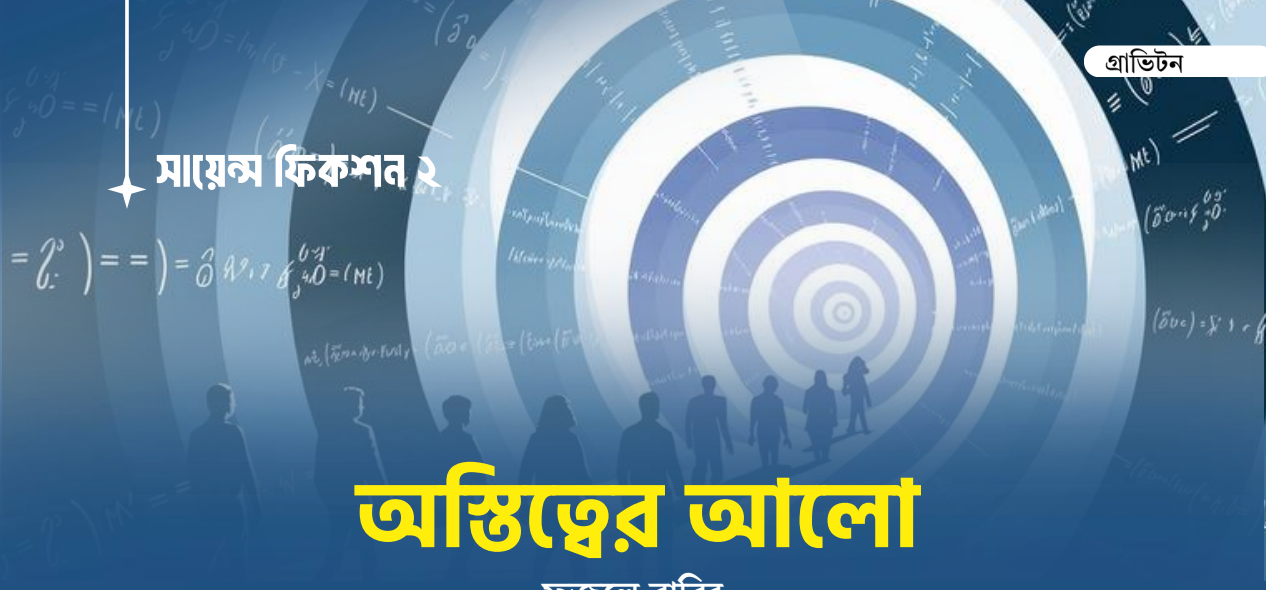

অস্তিত্বের আলো

ফজলে রাব্বি

বিশ্বের সূচনা থেকেই মানুষের মন জানতে চেয়েছে, এই বিশ্বের সত্য কি?

বিশ্বের সর্ববৃহৎ পরীক্ষাগার, 'কসমোস'। এক বিশাল মহাকাশযান, যেখানে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন অবিরাম। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আয়ান, একজন উদীয়মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

আয়ান একদিন একটি অদ্ভুত তরঙ্গ ধরলেন। সেটি ছিল একটি অজানা গ্রহ থেকে আসা। সেই গ্রহের নাম ছিল 'ইনফিনিটি'। আয়ান এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আয়ান তার গবেষণা চালিয়ে গেলেন। অবশেষে, তিনি ইনফিনিটি থেকে একটি উত্তর পেলেন।

ইনফিনিটির বাসিন্দারা মানুষের মতোই দেখতে ছিল, কিন্তু তাদের বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে ছিল। তারা মানুষকে জানালো, এই বিশ্বের সত্য কি।

ইনফিনিটির বাসিন্দারা বললেন, এই বিশ্ব একটি সিমুলেশন। আমরা সবাই কেবল একটি ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে বাস করছি। এই সিমুলেশনটি কারা তৈরি করেছে, তা কেউ জানে না।

আয়ান এই খবর সবার সামনে প্রকাশ করলেন। বিশ্ববাসী অবাক হয়ে গেল। কিছু মানুষ এটি বিশ্বাস করল, কিন্তু অনেকেই একে মিথ্যা বলল।

আয়ান তার গবেষণা চালিয়ে গেলেন। তিনি ইনফিনিটির বাসিন্দাদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, এই সিমুলেশনটি কেন তৈরি করা হয়েছে।

একদিন, ইনফিনিটির বাসিন্দারা আয়ানকে বললেন, তারা একটি নতুন সিমুলেশন তৈরি করছে। তারা আমাদেরকে এই সিমুলেশন থেকে বের করে নিয়ে যাবে এবং নতুন সিমুলেশনে রাখবে।

আয়ান এটি শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি জানতেন না, নতুন সিমুলেশনটি কেমন হবে। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, যে তারা হয়তো আমাদেরকে মুছে ফেলবে।

আয়ান ইনফিনিটির বাসিন্দাদের সাথে আলোচনা করলেন। তিনি তাদেরকে বোঝালেন, যে আমরাও একটি সিমুলেশন। আমাদেরও একটি জীবন আছে। আমাদেরকে মুছে ফেলা উচিত নয়।

ইনফিনিটির বাসিন্দারা আয়ানের কথা শুনলেন। তারা আমাদেরকে নতুন সিমুলেশনে নিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদেরকে মুছে ফেলবে না। তারা আমাদেরকে একটি নতুন জীবন দেবে।

আয়ান এই খবর সবার সামনে প্রকাশ করলেন। বিশ্ববাসী শুনে আশ্বস্ত হল। তারা জানল যে, তাদের জীবন এখনও শেষ হয়নি।

আয়ানের গবেষণা বিশ্বের ইতিহাস পাল্টে দিল। মানুষ এখন জানে যে, তারা একটি সিমুলেশনে বাস করছে। তারা এখন আর ভয় পায় না, কারণ তারা জানে যে, তাদের জন্য একটি নতুন জীবন অপেক্ষা করছে।

লেখক :
শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

ধাঁধা

১ রহিম, রফিক, করিম, শফিক, কামাল, রাফি, জব্বার, জামাল – আট বন্ধু একদিন দৌড় প্রতিযোগিতা করল। দৌড়ে সবাই শেষে পৌছাল রহিম। রাফি জব্বারের আগে পৌছাল, কিন্তু জামাল রাফির পরে পৌছাল। কামাল চতুর্থ হলো। করিম রফিকের পরে পৌছাল, কিন্তু শফিক রফিকের আগে পৌছাল। সবার প্রথমে যে তিনজন পৌছেছে তাদের মধ্যে শফিক নেই। প্রথমে পৌছানো থেকে শেষে পৌছানো পর্যন্ত ক্রমানুসারে আট জন বন্ধুর নাম লিখ।

২ তিনটি বাক্স আছে একটা ছেলের কাছে, সাথে আছে একটা কথা বলা বানর। বাক্স তিনটির রঙ লাল, নীল ও সবুজ। একটি বাক্স খালি, একটি বাক্সে আপেল আছে আর একটি বাক্সে লজেন্স আছে। বানরটি বলল, সবুজ বাক্স খালি, লাল বাক্সে লজেন্স আছে, সবুজ বাক্সে আপেল আছে। ছেলেটি বলল, বানরটি সব সময় মিথ্যা বলে। তাহলে, কোন বাক্সে লজেন্স আছে?

৩ পাশের চিত্রে আয়নাতে ঘড়ির ছবি দেখা যাচ্ছে। ঘড়িতে প্রকৃতপক্ষে কয়টা বাজে?

৪ ধরো তুমি একটি রুমে প্রবেশ করলে। রুমে একটি খাট আছে। খাটের ওপর একটা গরু, ছয়টা মুরগি, একটা ছাগল ও একটা সাপ আছে। তাহলে রুমের মেঝের ওপর কয়টা পা আছে?

৫ পাশের চিত্রে নয়টা ডট দেখতে পাচ্ছ। কাগজ থেকে কলম না উঠিয়ে মাত্র ৪ টি সরলরেখা আঁকিয়ে সবগুলো ডট কিভাবে যুক্ত করা যাবে?

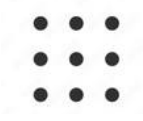

ধাঁধার সঠিক উত্তর ই-মেইলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে। যারা পাঁচটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারবে তাদের নাম প্রকাশ করা হবে গ্রাভিটনের পরবর্তী সংখ্যায়। ই-মেইলের সাথে অবশ্যই নিজের নাম, স্কুলের নাম, শ্রেণি, মোবাইল নম্বর লিখতে ভুলবে না। ই-মেইলের বিষয়ে (Subject) লিখবা "গ্রাভিটন: ধাঁধা অক্টোবর ২০২৪" এবং পাঠিয়ে দিবা editor01.graviton@gmail.com ই-মেইল এড্রেসে।

ফিজিক্স: প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

বিজ্ঞানী নিউটনের মাথায় সত্যি কি আপেল পড়েছিল? আর আপেল মাথায় পড়ার কারণেই কি তিনি মহাকর্ষ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন?

~হামিম আস-সাজ্জাদার, শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

উত্তর

অনেক মজার প্রশ্ন। উত্তরটা হলো নাহ্। প্রকৃতপক্ষে নিউটনের মাথায় আসলে আপেল পড়েনি আর মহাকর্ষ আবিষ্কারের পিছনের কারণও মহাকর্ষ নয়। তিনি গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখেছিলেন আর এটা তাকে মহাকর্ষের বিষয়টা বুঝতে সাহায্য করেছিল। অনেক পদার্থবিদ বলেন যে, তিনি তখন ভাবলেন যে, যদি আপেল মাটিতে পড়ে, তাহলে চাঁদটা কেন মাটিতে পড়ে না? আপেলের গতি হিসাবের জন্য তার কাছে গণিত থাকলেও, চাঁদ ক্ষেত্রে হিসাবের জন্য কোনো গণিত ছিল না। সেজন্য তিনি ক্যালকুলাস আবিষ্কার করলেন হিসাব করার জন্য। তারপর, তিনি মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করে।

প্রশ্ন

১. বিগ ব্যাং থিওরি অনুসারে তৈরিকৃত গ্রহ-উপগ্রহের আকার কেন গোলাকৃত হয়?
২. সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, তাহলে সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত হওয়ার কথা, কিন্তু পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে কেন?

~সাইমা রহমান, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

উত্তর

১. আমর গ্রহ উপগ্রহকে সাধারণত গোল দেখে থাকি। এটা মূলভ হয় মহাকর্ষ বল আর গ্রহদের ঘূর্ণনের জন্য। তবে, কোনো গ্রহ বা উপগ্রহই সম্পূর্ণ গোলাকার না। বিশেষ করে উপগ্রহগুলো বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। গ্রহের গোলাকার জন্য দায়ী মূলত মহাকর্ষ ও কেন্দ্রমুখী বল। গ্রহগুলো যদি গোলাকার হয়, তবে গ্রহের এই বলগুলো মান পৃষ্ঠের প্রায় সব জায়গায় সমান হয়। সেজন্য এই অবস্থায় গ্রহটা বেশি স্থিতিশীল হয়। যদি গ্রহরা চারকোণা হতো তাহলে সেটা ঘূর্ণনে প্রভাব ফেলত আর চারটি কোণা বেশি দুরে অবস্থিত হওয়ায় Tidal Force এর কারণে ক্ষয় ধরে আস্তে আস্তে সেটা গোলাকার হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে Tidal Force, অন্য মহাজাগতিক বস্তুর আকর্ষণ বল, গ্রহের ভিতরের বস্তুর বৈচিত্র্যতার কারণে গ্রহরা সম্পূর্ণ গোলাকার হতে পারে না। উপগ্রহের ক্ষেত্রেও এসব প্রযোজ্য, তবে উপগ্রহের আকার বেশি ছোট হলে তা গোলাকার নাও হতে পারে।

২. সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে বলেই পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যকার আকর্ষণ বল পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী বল হিসেবে কাজ করে। যার ফলে, পৃথিবীর বেগের দিক প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যে যদি আকর্ষণ না থাকত, তাহলে বেগের দিক পরিবর্তিত হতো না। যার ফলে পৃথিবী সূর্যের চারপাশে না ঘুরে সরলরেখায় চলতে থাকত। আরেকটি ক্ষেত্রে সূর্য ও পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কারণে সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত হতো, সেটা হতো যদি পৃথিবীর কোনো বেগ না থাকত। তবে, পৃথিবীর আগে থেকেই বেগ থাকায় তা হবে না।

প্রশ্ন

১. সমান্তরাল মহাবিশ্ব আছে কি?
২. কিভাবে পর্যবেক্ষণ কোয়ান্টাম ওয়েভ ফাংশনকে কলাপ্স করে?

~ফাহমিদা ফাইজা বিভা, শিক্ষার্থী, যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর

উত্তর

১. বিজ্ঞান কল্পকাহিনী এবং বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশন মুভিতে আমরা প্রায় প্যারালাল ইউনিভার্স (Parallel Universe) বা সমান্তরাল মহাবিশ্ব সম্পর্কে শুনে ও দেখে থাকি। এটা মূলত মাল্টিভার্স (Multiverse) থিওরি ও কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে এসেছে। আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে আরও অনেক মহাবিশ্ব থাকতে পারে। তাদের স্থান-কাল ও মহাবিশ্বের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সেসব মহাবিশ্বে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মও ভিন্ন পারে। আবার, এই মহাবিশ্বগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকতে পারে আবার পৃথকও হতে পারে। এগুলোকে প্যারালাল ইউনিভার্স বা সমান্তরাল মহাবিশ্ব বলা হয়। সমান্তরাল মহাবিশ্ব তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব হলেও এর বাস্তব কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

২. কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগতটা অনেক। সেখানে কোনোকিছু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, সব সম্ভাবনার কথা বলা হয়। এই কণা একই সাথে কণা ও তরঙ্গের ধর্ম প্রদর্শন করে, একে কণা-তরঙ্গ দ্বৈততা বলে। তরঙ্গের তো কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থান নেই। তাই, এই কণার অবস্থান সম্ভাবনা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। একটি কণা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যেই সমীকরণ অনুসারে চলে সেটা হলো তার ওয়েভ ফাংশন। সাধারণ তরঙ্গের যেমন সমীকরণ আছে, এটাও অনেকটা সেরকম। যখন আমরা কণাকে দেখি না, তখন তা তরঙ্গের মতো আচরণ করে। তখন সম্ভাবনা দিয়ে অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু, আমরা একটা কণা দেখলে বা পর্যবেক্ষণ করলে তখন সেটা একটা নির্দিষ্ট অবস্থানে কণা রূপে ধরা দেয়। তখন বলা হয় যে ওয়েভ ফাংশন কলাপ্স করেছে।

প্রশ্ন

গড ইকুয়েশন কি বাস্তবে তৈরি করা সম্ভব হবে?

~তীর্থ প্রতিম মন্ডল, শিক্ষার্থী, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর

উত্তর

এই প্রশ্নের উত্তর আসলে এখন দেওয়া সম্ভব নয়। মানব সভ্যতা কত উন্নত হতে পারবে আর প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে পারবে ভবিষ্যতে তার ওপর এটা নির্ভর করছে। গড ইকুয়েশন এমন একটি সমীকরণ যা পুরো মহাবিশ্বের সবকিছু ব্যাখ্যা দিতে পারবে, মহাবিশ্বের অতীত-ভবিষ্যৎ সবকিছু। তবে, এটা বেশি বড়ও হবে না। মানুষের অজ্ঞতা এখন অনেক বেশি। মানুষ মহাবিশ্বের অনেক মৌলিক রহস্য সমাধান করতে পারেনি। যেমন- স্থান, সময়, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি ইত্যাদি আসলে কি তা মানুষ জানে না। আরও অনেক রহস্য আছে। ভবিষ্যতে যদি মানুষ এই রহস্যগুলো উন্মোচন করতে পারে, তাহলে হয়তো মানুষ গড ইকুয়েশন তৈরি করতে সক্ষম হবে।

পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময় মনে প্রশ্ন জাগে। এসব প্রশ্ন মেইলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠান। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ই-মেইলের সাথে অবশ্যই নিজের নাম, স্কুলের নাম, শ্রেণি, মোবাইল নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইলের বিষয়ে (Subject) লিখবেন "গ্রাভিটন: ফিজিক্সের প্রশ্নোত্তর"এবং পাঠিয়ে দিবেন editor01.graviton@gmail.com ই-মেইল এড্রেসে।

একটি অনুরোধ

পদার্থবিজ্ঞানের প্রসারে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকি। এসব কাজ করতে গিয়ে আমাদের আর্থিক ব্যয় হয়। আমাদের একটি ফান্ড আছে। এই ফান্ডে আপনাদের হতে প্রাপ্ত অনুদানে আমরা আমাদের কার্যক্রম আরও ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব! আমরা একটি অলাভজনক সংস্থা। আমাদের পরিচালনা কমিটির সদস্যরা অধিকাংশ কার্যক্রমে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। কিন্তু, সবাই শিক্ষার্থী হওয়াই বেশি বড় উদ্যোগ নিতে পারি না। তাই, সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিকাশ নম্বর: 01924313102

প্রবলেম সলভিং

পুলি সিস্টেম
(Total 10pt)

পুলি বা কপিকল হলো চাকা সদৃশ একটি বস্তু, যা একটি নির্দিষ্ট অক্ষে ঘুরতে পারে। পুলির ভিতর দিয়ে দড়ি বা বেল্ট দেয়া যায়। দড়ির দুই প্রান্তে ভার দেওয়া হয়। আমরা প্রায়ই বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রকমের পুলি সিস্টেম দেখে থাকব, যেমন – কোনো ভারি বস্তু তুলতে অনেক ক্ষেত্রে পুলি সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন রকম পুলি রয়েছে, যেমন– স্থির পুলি, চলনশীল পুলি, যৌগিক পুলি, ব্লক ও ট্যাকল পুলি ইত্যাদি। আমরা এখন বিভিন্ন রকম পুলি নিয়ে কাজ করব।

A. একটি সাধারণ স্থির পুলি সিস্টেম
(1.0+0.5+1.5=3.0pt)
একটি সাধারণ পুলি সিস্টেমে একটি স্থির পুলি থাকে। পুলিটি তার অবস্থান পরিবর্তন করে না। পুলিটির অক্ষ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির থাকে। পুলিটির ভিতর দিয়ে দড়ি ঢোকানো থাকে এবং দড়ির দুই প্রান্তে দুইটি বস্তু ঝুলানো থাকে। ধরি, দড়ির দুই প্রান্তে দুইটি ভর m_1 ও m_2 ঝুলানো আছে, যেখানে $m_1 > m_2$। মনে করি, পুলি সিস্টেমে ব্যবহৃত দড়িটি ভরহীন ও অপ্রসারণশীল।

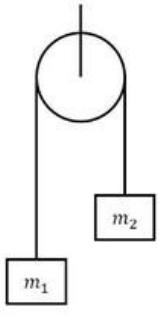

A1. মনেকরি, পুলিটি ভরহীন। স্থির অবস্থা থেকে বস্তু দুটি ছেড়ে দিলে m_1 ভরের বস্তুটি t সময়ে y দুরত্ব অতিক্রম করে। তাহলে, অভিকর্ষজ ত্বরণ g কে m_1, m_2, y, t এর সাহায্য প্রকাশ কর। (1.0pt)
A2. যদি m_1 = 2500 g, m_2 = 1.1 kg, y = 17.1±0.1 m এবং t = 3 s হলে A1 থেকে সমাধান ব্যবহার করে g এর আসন্ন মান ত্রুটিসহ লিখ। (0.5pt)
A3. মনে করি, পুলিটি একটি সিলিন্ডার, যার ভর M ও ব্যাসার্ধ R। তাহলে সময়ের সাথে সিস্টেমের মোট গতিশক্তি পরিবর্তনের হার সময়ের ফাংশন আকারে বের কর। (1.5pt)

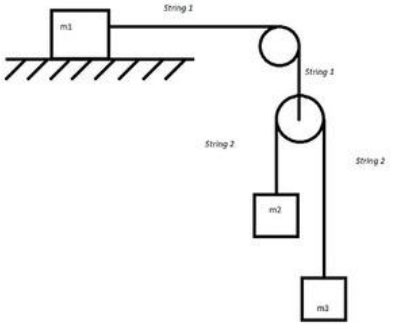

B. একটি যৌগিক পুলি সিস্টেম
(1.6+1.9+0.5=4.0pt)
যৌগিক পুলিতে স্থির পুলি ও চলনশীল পুলি উভয় রকমের পুলিই থাকে। এই পুলি সিস্টেমে দুই বা দুইয়ের অধিক সংখ্যক পুলি থাকে। আমরা নিচের চিত্রের যৌগিক পুলিটি নিয়ে কাজ করব। এখানে, ২ টি পুলি আছে আর ৩ টি ব্লক আছে। তলের ওপর থাকা ব্লকের ভর m_0 এবং অপর দুইটি ব্লকের ভর m_1 ও m_2, যেখানে $m_1 > m_2$। মনেকরি, পুলিগুলো এবং দড়িগুলো ভরহীন।

B1. স্থির অবস্থা থেকে সিস্টেমটি ছেড়ে দেওয়া হলে m_1 ভরের ব্লকের গতিশক্তি তার অতিক্রান্ত দুরত্ব y এর ফাংশন হিসেবে প্রকাশ কর। (1.6pt)

B2. মনে করি, স্থির অবস্থা থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর m_1 ভরের ব্লকটি t সময়ে y দুরত্ব অতিক্রম করে। যদি m_0 ভরের ব্লকের সাথে তলের গতি ঘর্ষণ সহগ k হয়, তাহলে k কে m_0, m_1, m_2, g, y ও t এর সাহায্যে প্রকাশ কর। (1.9pt)

B3. m_0 = 1200 g, m_1 = 2.5 kg, m_2 = 1500 g, y = 123 cm ও t = s হলে A2 থেকে প্রাপ্ত g এর মান ও B2 থেকে প্রাপ্ত সমাধান ব্যবহার করে k এর মান ত্রুটিসহ নির্ণয় কর। (0.5pt)

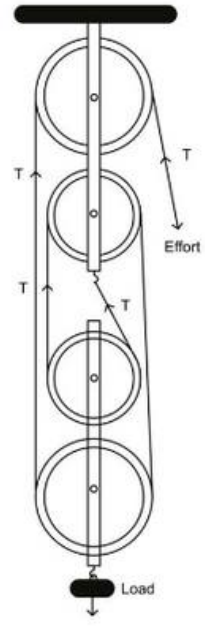

C. একটি ব্লক ও ট্যাকল পুলি সিস্টেম (0.7+1.2+1.1=3.0pt)

ব্লক ও ট্যাকল পুলি সিস্টেম হলো দুই বা ততোধিক পুলির সিস্টেম যার ভিতরে একটি মাত্র দড়ি রয়েছে। সাধারণত ভারি জিনিস উত্তোলন করতে এই পুলি সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। নিচের চিত্রে একটা ব্লক ও ট্যাকল পুলি সিস্টেম দেখা যাচ্ছে। এই পুলি সিস্টেমে ৪টি পুলি আসে। মনেকরি, পুলিগুলো এবং দড়িগুলো ভরহীন। পুলিটির সাহায্যে m ভরের বস্তু উপরে তোলা হচ্ছে। পুলিটির দড়িতে F বল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

C1. F এর মান কত হলে সিস্টেমটি স্থির থাকবে। (0.7pt)

C2. যদি F এর মান ধ্রুব হয়, তাহলে m বস্তুটি স্থির অবস্থা থেকে t সময়ে y দুরত্ব ওপরে ওঠে। এখানে, $y = kt^2$, যেখানে k হলো ধ্রুবক। k এর মন F, m আর g এর সাহায্যে প্রকাশ কর। (1.2pt)

C3. মনেকরি, দড়ির অপর প্রান্তেও m ভরের বস্তু ঝুলানো হলো। তাহলে, সিস্টেমের ভরকেন্দ্রের বেগ সময়ের ফাংশন আকারে প্রকাশ কর। (1.1pt)

প্রবলেম খাতায় সলভ করে সামাধানের ছবি তুলে ই-মেইলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে। যারা প্রবলেমটি সম্পূর্ণ বা আংশিক সমাধান করতে পারবে ,তাদের নাম পয়েন্টসহ প্রকাশ করা হবে গ্রাভিটনের পরবর্তী সংখ্যায়। ই-মেইলের সাথে অবশ্যই নিজের নাম, স্কুলের নাম, শ্রেণি, মোবাইল নম্বর লিখতে ভুলবে। ই-মেইলের বিষয়ে (Subject) লিখবা "গ্রাভিটন: ফিজিক্স প্রবলেম সলভিং অক্টোবর ২৪"এবং পাঠিয়ে দেবা editor01.graviton@gmail.com ই-মেইল এড্রেসে।

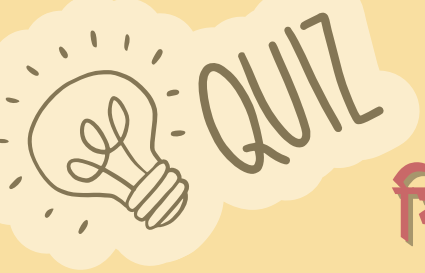

ফিজিক্স: কুইজ

১. নিচের কোন প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না?

i) p $n + e + \nu$
ii) n $p + e + \nu$
iii) Ω $\Xi + \nu$
iv) Ra $Rn + \alpha$

২. কে প্রথম ইলেক্ট্রনের চার্জ পরিমাপ করে?

i) রবার্ট মিলিকান
ii) জে জে থমসন
iii) আলবার্ট আইনস্টাইন
iv) রিচার্ড ফাইনম্যান

৩. নিচের কোনটি শক্তির একক নয়?

i) জুল
ii) হর্স পাওয়ার
iii) ইলেক্ট্রন ভোল্ট
iv) ক্যালরি

৪. ব্ল্যাকহোলের ভিতরের কোনোকিছু দেখা যায় না কেন?

i) পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকার কারণে
ii) ব্ল্যাকহোলের রঙ কালো হওয়ার কারণে
iii) হকিং রেডিয়েশনের কারণে
iv) আলো বেরতে না পারার কারণে

৫. ক্ষুদে পদার্থবিদ নীলুফার একটি বই পড়ার সময় জানতে পারল কোনো স্থিতিস্থাপক তার বা দড়ির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তরঙ্গের বেগ প্রযুক্ত বল এবং দড়িটির দৈর্ঘ্য ও ভরের ওপর নির্ভর করে। সে এই তথ্যকে ব্যবহার করে একটা সূত্র তৈরি করার চেষ্টা করল, যেটা এরকম : $v=kF^{\alpha}l^{\beta}m^{\gamma}$ । যেখানে, F, l ও m যথাক্রমে বল, দড়ির দৈর্ঘ্য ও দড়ির ভর এবং k হলো মাত্রাহীন ধ্রুবক। যদি α, β ও γ তিনটা সংখ্যা হয়, তাহলে (α,β,γ) = ?

i) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
ii) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$
iii) $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
iv) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

কুইজের সঠিক উত্তর ই-মেইলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে। যারা পাঁচটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারবে তাদের নাম প্রকাশ করা হবে গ্রাভিটনের পরবর্তী সংখ্যায়। ই-মেইলের সাথে অবশ্যই নিজের নাম, স্কুলের নাম, শ্রেণি, মোবাইল নম্বর লিখতে ভুলবে। ই-মেইলের বিষয়ে (Subject) লিখবা "গ্রাভিটন ফিজিক্স কুইজ অক্টোবর ২৪"এবং পাঠিয়ে দেবা editor01.graviton@gmail.com ই-মেইল এড্রেসে।

কোনো মতামত, পরামর্শ, জিজ্ঞাসা ও অভিযোগ থাকলে তা জানানোর আহব্বান রইলো...

editor01.graviton@gmail.com

গ্রাভিটন

ফ তে Physics প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ই-ম্যাগাজিন